শ্রমিক

দ্বাবিংশ বর্ষ | ১ম ও ২য় সংখ্যা | জানুয়ারি-ডিসেম্বর, ২০১৯

১. অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকদের সংগঠিতকরণ: ঢাকা শহরের রিক্সাচালকদের ওপর বিল্‌স পরিচালিত জরিপ

২. পাট শিল্পের সংকট: উত্তরণে করণীয়

৩. তৈরি পোশাক শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ: প্রত্যাশা ও বাস্তবতা

৪. টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ও বাস্তবতা

৫. কর্মক্ষেত্রে মানসিক স্বাস্থ্য

৬. নারী শ্রমিকদের সমস্যা ও করণীয়

৭. পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা: বিল্‌স এর উদ্যোগ ও কার্যক্রম

৮. শিশুরা শ্রমের হাতিয়ার নয়, জাতির ভবিষ্যৎ

শ্রমিক

দ্বাবিংশ বর্ষ | ১ম ও ২য় সংখ্যা | জানুয়ারি-ডিসেম্বর, ২০১৯

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স

www.bilsbd.org

শ্রমিক

দ্বাবিংশ বর্ষ | ১ম ও ২য় সংখ্যা | জানুয়ারি-ডিসেম্বর, ২০১৯

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা পরিষদ

অ্যাকাডেমিক

ড. মনিরুল ইসলাম খান

ড. মোঃ রেজাউল করিম

ট্রেড ইউনিয়ন

মেসবাহউদ্দীন আহমেদ

অধ্যাপিকা জাহানারা বেগম

শহীদুল্লাহ চৌধুরী

মোঃ মজিবুর রহমান ভূঞা

রওশন জাহান সাথী

প্রধান সম্পাদক

নজরুল ইসলাম খান

সম্পাদক

মোঃ মজিবুর রহমান ভূঞা

সহযোগী সম্পাদক

মোঃ ইউসুফ আল-মামুন

মুদ্রণ

সারকো মিডিয়া এইউ সার্ভিসেস

৮৫/১ ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০

প্রকাশক

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স

বাড়ি: ২০, সড়ক ১১ (নতুন) ৩২ (পুরাতন), ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯

ফোন: ৮৮০-২-৯০২০০১৫, ৯১২৬১৪৫, ৯১৪৩২৩৬, ৯১১৬৫৫৩

ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৫৮১৫২৮১০ ই-মেইল: bils@citech.net

ওয়েব: www.bilsbd.org

শ্রমিক

দ্বাবিংশ বর্ষ | ১ম ও ২য় সংখ্যা | জানুয়ারি-ডিসেম্বর, ২০১৯

সূচিপত্র

১. অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকদের সংগঠিতকরণ:
ঢাকা শহরের রিক্সাচালকদের ওপর বিল্‌স পরিচালিত জরিপ ৭

২. পাট শিল্পের সংকট: উত্তরণে করণীয় ১৬

৩. তৈরি পোশাক শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ:
প্রত্যাশা ও বাস্তবতা ২৭

৪. টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ও বাস্তবতা ৩৭

৫. কর্মক্ষেত্রে মানসিক স্বাস্থ্য ৪০

৬. নারী শ্রমিকদের সমস্যা ও করণীয় ৫১

৭. পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা: বিল্‌স এর উদ্যোগ ও কার্যক্রম ৫৪

৮. শিশুরা শ্রমের হাতিয়ার নয়, জাতির ভবিষ্যৎ ৫৯

সম্পাদকীয়

শ্রমবাজারের আকার বাড়ছে। সাথে সাথে পাল্টাচ্ছে এর বৈশিষ্ট্যও। অটোমেশনের বিস্তার এখন বিশ্ব মানচিত্রে এবং তা ধীরে ধীরে দৃশ্যমান হচ্ছে বাংলাদেশের শিল্পেও। প্রযুক্তির উৎকর্ষ হিসেবে বিবেচিত হলেও শ্রমিকের অস্তিত্বের জন্য এটি বড় হুমকি বলে আশংকা করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই অটোমেশনের প্রভাব পড়তে শুরু করেছে দেশের পোশাক, চাতাল থেকে শুরু করে ছোট-বড় বিভিন্ন শিল্পে। যেখানে বাস্তবায়ন হচ্ছে, সেখানে শ্রমিক ছাঁটাই হয়ে তাদের সংখ্যা জ্যামিতিক হারে কমে আসছে।

এর পাশাপাশি রয়েছে শোভন কাজ এবং শোভন কর্মক্ষেত্র নিশ্চিতকরণে দৈনতা, যা শ্রমিককে প্রতিনিয়িত ফেলছে ঘোর দুর্বিপাকে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির পাশাপাশি, বাঁচার মতো মজুরির অভাব, বেতন-বোনাস-ওভারটাইম পাওয়ার ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা, অর্থনৈতিক বৈষম্য ইত্যাদি শ্রমিকের জীবনকে ক্রমশই দুর্বিসহ করে তুলছে।

অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে এই সমস্ত ঝুঁকি আরও বেশি। এমনিতেই প্রাতিষ্ঠানিকের চেয়ে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত প্রায় চার গুণ বড়। তাই এই ঝুঁকির প্রভাব সেখানে অনেক বেশি দৃশ্যমান। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতসমূহ নিয়ে বিল্স প্রায়শই গবেষণা করে আসছে এবং এর ফলাফল পর্যালোচনা করে সুপারিশমালা প্রণয়ণের মাধ্যমে উপস্থাপন করছে নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে। আমরা মনে করি সদিচ্ছা থাকলে মালিক-শ্রমিক-সরকার এই ত্রিপক্ষীয় কাঠামোর মাধ্যমে সমস্যাসমূহ সমাধানে অগ্রসর হওয়া সম্ভব।

ভিশন ২০২১ এর অগ্রগতি ও ফলাফল নিয়ে কথা বলার সময় এসেছে। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী নিকটবর্তী। টেকসই উন্নয়নের ধারাবাহিকতাও চলমান। সেই সাথে ২০২৪ সালে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত দেশে উন্নীত হওয়ার প্রচেষ্টায় রয়েছে বাংলাদেশ। এ সমস্ত উন্নয়নের পুর্বশর্ত শ্রমজীবি মানুষের আয় ও জীবনধারণের সন্তোষজনক উন্নয়ন। সে লক্ষ্যকে সামনে নিয়েই সকলকে এগিয়ে যেতে হবে।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিল্স এর বাংলা জার্নাল "শ্রমিক" এর বর্তমান সংখ্যায় স্বল্পায়তন ও বিশ্লেষণধর্মী কিছু লেখা স্থান পেয়েছে। এই লেখাগুলো তথ্যবহুলও বটে। আশা করা যায় লেখাগুলো পাঠক ও গবেষকদের কাজে লাগবে। জার্নালটি প্রকাশনায় সহযোগিতার জন্য ফ্রেডরিক ইবার্টি স্টিফটুং (এফইএস) এর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

মোঃ মজিবুর রহমান ভূঞা
সম্পাদক

অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকদের সংগঠিতকরণ: ঢাকা শহরের রিক্সাচালকদের ওপর বিল্‌স পরিচালিত জরিপ

ড. মোঃ রেজাউল করিম[১]
খন্দকার আঃ সালাম[২]

১. ভূমিকা

রিক্সা সারা বাংলাদেশ জুড়ে সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত পরিবহন। ঢাকা শহরের অন্ততঃ ৬০% অধিবাসী রিক্সায় চড়ে। রাজধানীতে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন (ডিসিসি) একমাত্র রিক্সা লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ, যা ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত ৭৯,৫৫৪ রিক্সার লাইসেন্স ইস্যু করেছে। তবে বর্তমানে ঢাকা শহরের রিক্সার প্রকৃত সংখ্যা ১০ লক্ষেরও অধিক। এ সেক্টরে অদক্ষ শ্রমিকই বেশি। এতে বিনিয়োগ ও আয় সহজ, বিশেষ দক্ষতা লাগে না, নগদ আয়, সহজ ব্যবস্থা, সহজলভ্য তাই শ্রমিকের সংখ্যাও বেশি। আনুমানিক ১৫ লক্ষ রিক্সা চালক ও তাদের পরিবার ঢাকা শহরে রিক্সার আয়ের উপর নির্ভরশীল। বাহন হিসেবে রিক্সার কিছু সুবিধাও আছে যেমন, ভাড়া তুলনামুলক কম, দুর্ঘটনার হারও কম, সমস্ত রাস্তায় চলার উপযুক্ত, দূষণমুক্ত ও পরিবেশ বান্ধব। তাই রিক্সা চালনার সাথে জড়িত আছে বৃহৎ একটি দরিদ্র গ্রামীণ জনগোষ্ঠি। যাহোক, ট্র্যাফিক জ্যামের জন্য রিক্সাকে প্রায়শই দায়ী করা হয়। শুধু এই কারণে, রিক্সা উন্নয়নের পরিবর্তে সামগ্রিক নীতি হচ্ছে ঢাকা শহর থেকে রিক্সা বন্ধ করা।

রিক্সা চালানো একটি কঠিন কাজ। রিক্সাচালকদের মানবাধিকার ও মর্যাদাও কম। তারা আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, যাত্রী, মোটর শ্রমিক এবং কিছু ক্ষেত্রে রিক্সা মালিকদের দ্বারা অবহেলা ও হয়রানির শিকার। তারা ঢাকা শহরের নিম্নমানের জীবন যাপন করে, বছরের বড় একটি অংশ জুড়ে পরিবার থেকে দূরে থাকে। এই বিশাল সংখ্যক রিক্সা চালকরা শ্রমিক হিসেবে তাদের মৌলিক অধিকারগুলো থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স, এলও-এফটিএফ কাউন্সিল-ডেনমার্কের সহযোগিতায় রিক্সাচালকদের কল্যাণের বিষয়ে কাজ করতে এগিয়ে এসেছে। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে ঢাকা শহরের রিক্সাচালদের সামগ্রিক অবস্থা জানতে বেসলাইন জরিপ হিসেবে বর্তমান গবেষণাটি পরিচালিত। গবেষণাটিকে একটি ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার করে রিক্সাচালকদের অধিকার পরিস্থিতির উন্নতি এবং তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব।

---

১ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকর্ম বিভাগের অধ্যাপক

২ বিল্‌স এর সিনিয়র ট্রেইনার

২. গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণাটি মূলত একটি ক্রস সেকশনাল ডিজাইন এবং এর প্রকৃতি প্রধানত সংখ্যাগত। ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের চারটি থানা এলাকার (বাড্ডা, হাজারীবাগ, যাত্রাবাড়ী ও শাজাহানপুর) ২০০ রিক্সাচালকের মধ্যে পরিচালিত জরিপের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গুণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে ২০ গ্যারেজ মালিক, ট্রাফিক পুলিশ এবং সিটি করপোরেশনের নির্বাহীদের কাছ থেকে। সংখ্যাগত তথ্য এসপিএসএস সফ্টওয়্যারে বিশ্লেষণ করা হয় এবং গুণগত তথ্য বিশ্লেষণ করে গবেষণার ফলাফলে তা উপস্থাপন করা হয়।

৩. গবেষণার ফলাফল

রিক্সা চালকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা

আবাসিক অবস্থা: ঢাকা শহরের সকল রিক্সাচালক অদক্ষ এবং গ্রামীণ এলাকা থেকে স্থানান্তরিত। তাদের অধিকাংশই পরিবার ছাড়াই ঢাকায় বাস করে এবং গ্রামের বসতবাড়িতে নিয়মিত যাতায়াত করে। তাই, ঢাকা শহরে রিক্সার সংখ্যা সীমিত করলে তাদের জীবিকার ঝুঁকি বাড়বে এবং এইসব দুর্বল মানুষকে আরও দুর্বল করে তুলবে।

সামাজিক-অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য: রিক্সাচালকদের গড় বয়স ৩৭ বছর, যা রিক্সা চালনার মতো একটি কঠিন কাজের জন্য সহায়ক বটে। তবে রিক্সা চালকদের পাঁচ শতাংশ ৬০ বছরেরও বেশি বয়সী, যা তাদের অসহায় অবস্থাকে নির্দেশ করে। এদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়টি মনোযোগের দাবি রাখে। প্রায় সব রিক্সাচালকরাই বিবাহিত। সুতরাং, তাদের পরিবারের সদস্যরা তাদের উপর নির্ভরশীল। তাদের শতকরা ৬০ ভাগ অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন। এটি এই সেক্টরের আধুনিকীকরণের জন্য উপযোগী হবে। রিক্সা চালকদের মাসিক গড় আয় ১৩,৩৮২ টাকা, যার ৬৮% আসে রিক্সা চালনা থেকে। প্রায় ৯০ ভাগের একমাত্র পেশা রিক্সা চালনা, যা এই পেশার ওপর তাদের একমাত্র নির্ভরতার ইঙ্গিত দেয়। রিক্সা চালকরা অত্যন্ত দরিদ্র। প্রায় এক তৃতীয়াংশের কোন জমি নেই। তাদের গড় জমি আছে মাত্র ১৩.০৫ ডেসিমল।

ঢাকায় বসবাসের ব্যবস্থা: ঢাকায় রিক্সাচালকদের স্বাভাবিক বাসস্থান ভাড়া বাড়ি (৫২%) বা রিক্সা গ্যারেজ (৪৭%), দুটোর অবস্থাই ভয়াবহ। ঢাকা শহরের রিক্সাচালকদের জীবনযাত্রার অবস্থা হচ্ছে একটি ঘরে বসবাসকারীর গড় সংখ্যা ২১ এবং প্রতি ব্যক্তি বসবাসের জন্য পায় গড়ে ২৮ বর্গফুট জায়গা। প্রায় সকলেই (৯৭.৪%) বলেছে তাদের বাসস্থানে বায়ু চলাচল যথেষ্ট নয়।

খাদ্য ব্যবস্থা: রিক্সা চালকদের অর্ধেকেরও বেশির খাদ্যের উৎস পরিবার। অন্যরা মেস ও হোটেলে খায়। লক্ষ্যণীয় যে, রিক্সা চালকদের ৮২% ধূমপান আসক্ত। তারা ধূমপানের জন্য গড়ে প্রতিদিন ৪৬.৪৬ টাকা খরচ করে।

কাজ ও কর্মপরিবেশঃ

পেশা হিসেবে রিক্সা চালনা: ঢাকায় রিক্সা চালকরা গড়ে প্রায় ১২.৬ বছর ধরে রিক্সা চালনায় জড়িত এবং এদের ৮০ শতাংশেরও বেশি রিক্সা চালনা শুরু করেছে ঢাকা শহর থেকে। রিক্সা চালনা শুরু করার আগে অধিকাংশই (৫৭.১%) ছিল দিনমজুর, ১৩.৮% যুক্ত ছিল ক্ষুদ্র ব্যবসায়, ১২.১% কৃষিকাজে। রিক্সা চালক হিসাবে কাজে আসার পেছনে প্রধান কারণ ছিল অন্য কোন কর্মসংস্থানের অভাব এবং এই পেশায় আসতে উৎসাহের কারণ ছিল এতে কোন পুঁজি ও দক্ষতার প্রয়োজন নেই।

কর্মঘন্টা ও ছুটি: রিক্সাচালকরা নিয়মিত প্রতি পাঁচ মাসে একবার তাদের গ্রামের বাড়িতে যায়। সাধারণত, তারা সারা বছর ধরে রিক্সা চালায়। ঢাকায় থাকা অবস্থায় ৬২% রিক্সা চালায় সপ্তাহে সাত দিন এবং ২৮% চালায় ছয় দিন। এরা দৈনিক ন্যূনতম এক শিফটের জন্য রিক্সা চালায়, গড়ে নয় ঘন্টা প্রতিদিন।

বিশ্রাম এবং অবসরকালীন কার্যকলাপ: রিক্সাচালকরা কাজের সময় প্রতি ১০৭ মিনিটে একবার বিশ্রাম নেয়। দিনে ৯ ঘণ্টা রিক্সা চালিয়ে প্রায় পাঁচবার বিশ্রাম নেয় তারা। বিশ্রামের জন্য কোন নির্দিষ্ট জায়গা নেই। সাধারণত এটি রাস্তার চা স্টল বা গাছের নিচে। ঢাকা শহরের রিক্সাচালকদের ঘুম, বিশ্রাম এবং অন্যান্য কার্যক্রমের জন্য প্রতিদিন ১৫ ঘণ্টা সময় থাকে। তাদের প্রায় সবাই কাজের অবসরে বিশ্রাম নেয় বা ঘুমায়। সুতরাং, তাদের প্রশিক্ষণ এবং সাংগঠনিক কার্যক্রমে যুক্ত করার সুযোগ আছে।

খাদ্য ও পানীয়: রিক্সা চালনা একটি কঠিন কাজ বিধায় রিক্সা চালকদের ঘন ঘন খাবার প্রয়োজন হয়। শতকরা নব্বই শতাংশের বেশি তাদের খাদ্য গ্রহণ করে অস্থায়ী কোন হোটেল রেস্টুরেন্ট থেকে।

রিক্সা চালনার অবস্থা

রিক্সার মালিকানা: ঢাকা শহরের প্রায় সকল রিক্সা (৯৬%) রিক্সাচালকদের মালিকানাধীন নয়। একটি রিক্সার মালিকানা ও রক্ষণাবেক্ষণের আর্থিক সঙ্গতি তাদের নেই। তারা প্রতিদিন গড়ে ১১১ টাকা পরিশোধ করে রিক্সা ভাড়ায় নিয়ে চালায়। এর জন্য কোন লিখিত চুক্তি বা নিরাপত্তা আমানতের প্রয়োজন হয় না। প্রায় সকল মালিক (৯৬%) রিক্সা রক্ষণাবেক্ষণের খরচ বহন করে এবং একে সচল রাখে। তবে দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে অধিকাংশ রিক্সা চালকদেরই মেরামত খরচ বহন করতে হয়।

রিক্সা গ্যারেজ: রিক্সাচালক গ্যারেজ মালিকের কাছ থেকে রিক্সা ভাড়া নেয়। একটি গ্যারেজ মালিকের রিক্সার সংখ্যা বিশ থেকে একশত হতে পারে। গ্যারেজ মালিকরা মুনাফা, জীবিকা ও কর্মসংস্থানের জন্য এই ন্যূনতম বিনিয়োগে ব্যবসা করে তুলনামূলকভাবে কম জটিলতায় সহজভাবে লাভ করে থাকে।

রিক্সাচালকদের ২১ শতাংশ জানায়, তারা গ্যারেজ থেকে কোন সুবিধা পায় না। যাহোক, তাদের অনেকেই সেখানে বিশ্রাম এবং থাকার সুবিধা গ্রহণ করে, যদিও তার মান বিশেষ ভাল না।

গ্যারেজ মালিকদের মতে, তারা গ্যারেজ চালানোর ক্ষেত্রে কিছু কিছু সমস্যার মুখোমুখি হয় যেমন, রিক্সা চালক ঋণ গ্রহণের পর বা রিক্সা চুরি / ছিনতাই এর পর অনেক সময় নিখোঁজ হয়ে যায়, দক্ষতার অভাবে দুর্ঘটনার শিকার হয়, বিভিন্ন সংগঠনের লোকজনের চাঁদা হুমকিতে পড়ে, উপযুক্ত বা সময়মতো রিক্সাচালক পায় না, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহের দুর্নীতির কবলে পড়ে ইত্যাদি।

গ্যারেজ মালিকরা রিক্সাচালকদের কিছু ব্যক্তিগত সমস্যার কথাও জানায় যেমন, প্যারিবারিক ঋণের বোঝা, পারিবারিক অসংগতি, জুয়া খেলায় আসক্তি, যৌন কর্মীদের সংসর্গ, ঢাকায় বাসস্থান সমস্যা ইত্যাদি।

রিক্সা চালনা ও রিক্সা থেকে আয়: ঢাকা শহরের রিক্সাচালকদের সর্বনিম্ন উপার্জন দৈনিক প্রায় ৩৬৪.৮ টাকা এবং সর্বোচ্চ উপার্জন দৈনিক প্রায় ৬৬৯.৮ টাকা। নেট গড় আয় দৈনিক প্রায় ৩৭১.৭ টাকা।

রিক্সা মালিকরা জানায়, দৈনিক আনুষঙ্গিক খরচাদি মিটিয়ে তাদের নেট আয় রিক্সা প্রতি দৈনিক ৩০ টাকা থেকে ৮০ টাকা পর্যন্ত থাকে; যা গড়ে প্রায় ৫৫ টাকা।

রিক্সা ও রিক্সা চালকের বৈধতা

রিক্সা লাইসেন্স: প্রায় দশ লক্ষ লাইসেন্সহীন রিক্সা চলছে ঢাকা শহরের রাস্তায়। এই বিষয়ে গ্যারেজ মালিকদের কৌশল হচ্ছে; কিছু সত্যিকারের লাইসেন্স ভাড়ার বিনিময়ে নেয়া এবং বাকিগুলোর ক্ষেত্রে অর্থের বিনিময়ে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থা থেকে নিয়মিত টিকিট নেয়া, যার কোন বৈধতা নেই। রিক্সাচালক এই টিকিটকেই রিক্সা লাইসেন্স হিসেবে জানে।

প্রায় অর্ধেক গ্যারেজ মালিক লাইসেন্সের উদ্দেশ্যে কখনও ডিসিসি পরিদর্শন করেনি। বাকি অর্ধেক লাইসেন্সের উদ্দেশ্যে ডিসিসি পরিদর্শন করে কিন্তু কিছুই পায়নি।

রিক্সাচালক প্রশিক্ষণ ও ড্রাইভিং লাইসেন্স: রিক্সা চালকদের ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদানের কোন বিধান নেই। তবে, ঢাকার মত শহরের রাস্তায় রিক্সা চালানোর জন্য ট্রাফিক নিয়ম সম্পর্কে তার জ্ঞান থাকা অপরিহার্য। রিক্সাচালকদের শারীরিক সক্ষমতা, দক্ষতা এবং রিক্সা চালনা, ট্রাফিক নিয়ম ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয় সম্পর্কে তাদের জ্ঞান বিবেচনা করে সফল পরীক্ষা মাধ্যমে ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান করা উচিত।

পেশাগত নিরাপত্তা এবং ঝুঁকি

রিক্সার ফিটনেস: রিক্সা চালনা একটি পরিশ্রমের কাজ। সেখানে নিরাপত্তা এবং ঝুঁকির বিষয় আছে। প্রথমতঃ, রিক্সার ফিটনেস ঠিক রাখা রিক্সাচালক ও যাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য জরুরি । ঢাকা শহরের রিক্সাচালকরা (৯২%) উল্লেখ করেছেন যে তাদের মালিকরা

রিক্সার ফিটনেস ঠিক রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, যা তাদের দৃষ্টিতে একটি ইতিবাচক দিক।

রিক্সা চালককে আটক করা: ট্রাফিক আইন লংঘনের দায়ে রিক্সাচালকদের প্রায়শই আটক হতে হয়। প্রায় অর্ধেক সংখ্যক চালক বলেছে ঢাকায় রিক্সা চালনার সময় তারা গড়ে প্রায় ৫ বার আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর দ্বারা আটক হয়েছে। আটক হওয়ার প্রধান কারণ ছিল ট্রাফিক সংকেত লঙ্ঘন', 'ভিআইপি রাস্তায় ড্রাইভিং ইত্যাদি। প্রত্যেকে গড়ে প্রায় ৫১ মিনিট আটক ছিলেন এবং ঘুষ দিয়ে অথবা কোনো শাস্তি ছাড়াই মুক্তি পান। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে তাদের রিক্সার সিট জব্দ করা নেয়া এবং চাকা পাংচার হওয়ার অভিজ্ঞতা আছে।

সড়ক দুর্ঘটনা মোকাবেলা: মারাত্মক না হলেও, রিক্সা চালকদের ঘন ঘন দুর্ঘটনা ঘটে। সাধারণতঃ রিক্সা চালকদের রিক্সা বা বাসের সাথে দুর্ঘটনা ঘটে। চালকরা বলেছে ঢাকায় রিক্সা চালনার সময় তারা গড়ে প্রায় ৬ বার এ ধরনের দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে। দুর্ঘটনার শিকার রিক্সাচালকরা সাধারণত মালিকদের কাছ থেকে কোনো ক্ষতিপূরণ পায় না।

রিক্সা চুরি বা ছিনতাই: ঢাকা শহরের এক চতুর্থাংশ রিক্সাচালকদের রিক্সা এক বা একাধিকবার হারিয়ে গেছে, চুরি বা ছিনতাই হয়েছে । এ ক্ষেত্রে তাদের ৩৫ ভাগকে পুর্ণ ক্ষতিপূরণ ৫৩ ভাগকে আংশিক ক্ষতিপূরণ দিতে হয়েছে।

রিক্সা চালকের অসুস্থতা ও চিকিৎসা: শতকরা ৯৪ ভাগ রিক্সাচালক রিক্সা টেনে এক বা একাধিক রোগে ভুগছেন। জ্বর সবচেয়ে সাধারণ একটি রোগ। এ ছাড়া কাশি ও ঠাণ্ডা, ব্যথা, দুর্বলতা, জন্ডিস, ডিসেন্ট্রি/ ডায়রিয়া ইত্যাদিও উল্লেখযোগ্য। প্রায় সকল (৯৬.২%) রিক্সাচালক চিকিৎসা গ্রহণ করে হাতুরে ডাক্তারের কাছে এবং খারাপ অবস্থা হলে তারা ফার্মেসি থেকে ঔষধ কিনে ব্যবহার করে।

রিক্সা চালকদের সাথে মানুষের আচরণ

রিক্সাযাত্রী: সকল রিক্সাচালক জানায় যে তারা যাত্রীদের দুর্ব্যবহারের মুখোমুখি। এইগুলো হল: শারীরিক আক্রমণ, ধমকানো, ভাড়া নিয়ে বিতন্ডা ও ঠকানো। রিক্সাচালকদের তথ্য অনুযায়ী, ৬৩.৭ ভাগ রিক্সাচালকের ওপর শারীরিক হামলা হয়েছে।

পুলিশ: রিক্সাচালকদের শতকরা ৯০ ভাগেরও বেশি (৯১%) উল্লেখ করেছে তারা পুলিশের কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের অসদাচরণের মুখোমুখি হয়, যেমন, বকা-ঝকা, শারীরিক আক্রমণ, টায়ার পাংচার করে দেয়া, রিক্সার আসনটি কেড়ে নেয়া, কান ধরে বসিয়ে রাখা ইত্যাদি।

রিক্সা মালিক: বেশিরভাগ রিক্সা চালক (৬০%) রিক্সা মালিকদের কাছ থেকে তেমন কোন দুর্ব্যবহারের সম্মুখীন হয় নি। তবে ৪০ শতাংশ বলেছে, রিক্সা নিয়ে দেরিতে ফিরলে বকা-ঝকা কিংবা শারীরিক দুর্ব্যবহারের সম্মুখীন হতে হয়।

রিক্সা চালকদের অধিকার ও সাংগঠনিক কার্যক্রম

রিক্সা চালকদের শ্রম অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা: ঢাকা শহরের রিক্সা চালকরা শ্রমিক হিসেবে তাদের অধিকারের কথা জানে না। যাহোক, গ্যারেজ মালিকদের মতে সস্তা বাসস্থান, প্রশিক্ষণ, ড্রাইভিং লাইসেন্স, আইডি কার্ড, পোশাক, মর্যাদা, চিকিৎসা সুবিধা, তাদের প্রতি বিনীত আচরণ, যুক্তিসঙ্গত ভাড়া, ঋণ, এগুলোই রিক্সাচালকদের অধিকার।

রিক্সা চালকদের সংগঠনে অংশগ্রহণ: রিক্সা সেক্টরে ডিসিসির নিয়ন্ত্রণের অভাবে কিছু কিছু অনিবন্ধিত সংগঠন রিক্সাচালকদের ব্যবহার করে ফায়দা লুটতে চায়। রিক্সাচালকদের অর্ধেকের বেশি এই ধরনের সংগঠনের নাম জানে তবে তেমন কেউ তাদের সাথে কোন যোগাযোগ রাখে না। এ সব সংগঠন রিক্সাচালকদের অধিকার রক্ষায় কোন ভূমিকা রাখে না। আবার, রিক্সাচালকদেও কেউই এসব প্রতিষ্ঠানে তাদের কোন সদস্য খুঁজে পায় নি। তবে, ৬২% রিক্সাচালক মনে করে সঞ্চয়, ঋণ গ্রহণ এবং রিক্সা চালকদের নিরাপত্তা ইত্যাদির প্রয়োজনে তাদের সংগঠন থাকা উচিত। যাহোক, তারা জানায় বারবার বাসস্থান পরিবর্তন হওয়া সংঠনে যুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে তাদের একটি বড় বাধা। এ ছাড়া অন্যান্য কিছু বাধার মধ্যে রয়েছে রিক্সাচালকদের আগ্রহের অভাব, সুযোগসন্ধানী সংগঠক, মালিকপক্ষের অনিচ্ছা ইত্যাদি।

৪. প্রস্তাবনা

বর্তমান গবেষণার ফলাফল থেকে জানা যায় যে, ঢাকা শহরের রিক্সাচালকরা শ্রমিক হিসেবে অনেক অধিকার এবং সুবিধা থেকে বঞ্চিত এবং কর্মক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার। তারা প্রায় অমানবিক জীবন যাপন করে। তাদেও কোন পেশাগত নিরাপত্তা নেই এবং তারা বেশিরভাগ সময়ে বিপদের সম্মুখীন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তারা শ্রমিক হিসেবে তাদের অধিকার সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত নয়, সংগঠিত নয়, কোনো প্রতিষ্ঠানের সদস্যও নয়। রিক্সাচালকদের অধিকার রক্ষা ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে কোন উদ্যোগ দেখা যায় নি। তাছাড়া, এই সেক্টর আধুনিকীকরণ এবং উন্নত করতে নেই কোন নীতি। বরং, সংখ্যার দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক দিক থাকা সত্তেও সেক্টরটি প্রধানত ট্রাফিক জ্যামের কারণেই নেতিবাচক হিসেবে চিহ্নিত। যাহোক, ঢাকা শহরে রিক্সা সেক্টরে এক মিলিয়নেরও বেশি অদক্ষ শ্রমিক কাজ করে। বিপুলসংখ্যক এই জনগোষ্ঠী যে সেক্টরের ওপর নির্ভর কওে বেঁচে থাকে তাকে অবহেলা করা উচিত নয়। বর্তমান গবেষণার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে রিক্সাচালকদের অধিকার বিষয়ে নিম্নলিখিত সুপারিশ তুলে ধরা হয়েছে। সুপারিশগুলো দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথমটি বিল্স এর জন্য এবং দ্বিতীয়টি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জন্য।

৫. বিল্স এর জন্য সুপারিশ

গবেষণা থেকে জানা গেছে যে মৌলিক অধিকার আদায়ের জন্য এবং রিক্সাচালকদের কল্যাণে তাদের সংগঠিত করা আবশ্যক। এ ক্ষেত্রে বিল্স দেশের প্রধান ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনসমূহকে উদ্যোগী করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। অধিকন্তু

বিল্‌স রিক্সা আধুনিকীকরণের জন্য যথাযথ নীতিমালা ও কর্মকাণ্ড গ্রহণে এবং রিকশাচালকদের উন্নয়নে যথাযথ কর্তৃপক্ষের সাথে এডভোকেসি পরিচালনা করতে পারে। এ ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে:

রিক্সাচালকদের সংগঠিতকরণ: বিল্‌স ১২টি জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের সঙ্গে যুক্ত। এই ফেডারেশনগুলোর রিক্সা ইউনিয়ন রয়েছে। যদিও ইউনিয়নগুলোতে রিক্সাচালকদের অংশগ্রহণ অত্যন্ত দুর্বল। সদস্য হতে রিক্সাচালকদের প্রধান বাধা তাদের নিয়ত পরিবর্তনশীল অবস্থা ও ঠিকানা। বিল্‌স ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্বের সহায়তায় বিভিন্ন কর্মশালার মাধ্যমে রিক্সাচালকদের সংগঠিত করতে বাস্তবসম্মত কৌশল গ্রহণ করতে পারে।

ট্রেড ইউনিয়নের জন্য প্রশিক্ষণ: রিক্সা সেক্টরে যে সব সংগঠনকে রিক্সাচালকরা চিহ্নিত করেছে (বেশিরভাগেরই কোন আইনগত ভিত্তি নেই) তারা তাদের সমস্যা সমাধানে আন্তরিক নয়। এই বিষয়টি রিক্সাচালকদের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন সম্পর্কে একটি নেতিবাচক ধারণা তৈরি করেছে। রিক্সাচালকদের সংগঠিতকরণের কাজে ইউনিয়ন কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিল্‌স এর উচিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করা ।

অধিকার অনুধাবন করতে শেখানো: কল্যাণ ও অধিকার অনুধাবন করতে রিক্সাচালক ও সংগঠকদের সংগঠিত করার জন্য বিল্‌স এর কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা উচিত।

রিক্সাচালককে প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ: রিক্সাচালকেরা তাদের অধিকার সম্পর্কে অবহিত নয়। তাদের অনেকেই ট্রাফিক আইন সম্পর্কে কোথাও কোনো প্রশিক্ষণ পায় নি। এটি শহরের ট্রাফিক ব্যবস্থার জন্য বড় সমস্যা সৃষ্টি করে। পাশাপাশি রিক্সা চালকদের নিরাপত্তাও বিঘ্নিত করে। তাছাড়া, রিক্সা চালকদের অনেকেই পেশাগত বিপদ এবং ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সমস্যার সম্মুখীন।

বিল্‌স এ ক্ষেত্রে রিক্সাচালকদের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ দিতে পারে:

১. ট্রাফিক আইন
২. শ্রমিক হিসেবে অধিকার
৩. রিক্সাচালকদের দায়িত্ব
৪. সঞ্চয় এবং ব্যয়
৫. ধূমপান ও মাদকাসক্তি থেকে বিরত থাকা
৬. পারিবারিক জীবন

কর্তৃপক্ষের সাথে এডভোকেসি: রিক্সা সেক্টরের সাথে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ সম্পর্কিত। এইগুলো হচ্ছে, ঢাকা সিটি কর্পোরেশন (উত্তর ও দক্ষিণ), স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি (কাউন্সিলর), শ্রম মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ইত্যাদি। এটা স্পষ্ট যে রিক্সা সেক্টরের উন্নতি এবং রিক্সাচালকদের শ্রম অধিকার ও কল্যাণ অনুধাবন এই কর্তৃপক্ষের উপর নির্ভর করে। তবে রিক্সা সেক্টর ও রিক্সা চালক সম্পর্কিত বিষয়ে এই সমস্ত কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তেমন কোন প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

এ ক্ষেত্রে রিক্সা সেক্টরের আধুনিকীকরণের জন্য নীতি ও কর্মকাণ্ড গ্রহণ এবং পাশাপাশি রিক্সা চালকদের অবস্থার উন্নতি ও তাদের সিটিজেন চার্টারে অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে এই সমস্ত কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের সহায়তায় বিল্‌স এর অ্যাডভোকেসি করা প্রয়োজন।

অ্যাডভোকেসি এবং গ্যারেজ মালিকদের সহযোগিতা: গ্রাম থেকে ঢাকায় আসা রিক্সাচালকদের জন্য রিক্সা গ্যারেজগুলি থাকার স্বাভাবিক জায়গা। তারা তাদের অধিকাংশ সময় ব্যয় করে গ্যারেজে। সুতরাং, রিক্সাচালকদের জন্য নেয়া কর্মসূচি হতে হবে গ্যারেজ ভিত্তিক। গ্যারেজের মধ্যে সুযোগ-সুবিধা কম থাকায় গ্যারেজ মালিকদের সঙ্গে রিক্সাচালকদেও কোন আনুষ্ঠানিকতার ব্যবস্থা নেই। তা সত্ত্বেও, এটা স্পষ্ট যে, রিক্সা চালকদের সংগঠিত এবং তাদের কল্যান নিশ্চিত করতে গ্যারেজের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার সুযোগ রয়েছে। গ্যারেজ মালিকরাও এই বিষয়ে বেশ ইতিবাচক। এ ক্ষেত্রে বিল্‌স এর গ্যারেজ মালিকদের সঙ্গে কাজ করা দরকার যাতে তারা রিক্সাচালকদের জন্য আরও ভাল সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে। এখানে উল্লেখ্য, রিক্সা গ্যারেজের মালিকরা তাদের ব্যবসায় বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়। এই ব্যবসার মাধ্যমে তাদের আয় অনেক বেশি নয়। সুতরাং, বিল্‌স গ্যারেজ মালিকদের প্রযুক্তিগত এবং আর্থিক সাহায্য পাওয়ার ব্যাপারেও অ্যাডভোকেসি করতে পারে।

রিক্সাচালকদের সঙ্গে ভদ্র আচরণে প্রচারাভিযান: রিক্সাচালকরা যাত্রী, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য, মোটর ড্রাইভার এবং অন্যদের দুর্ব্যবহারের শিকার। এ ক্ষেত্রে তাদের প্রাপ্য সহানুভূতিশীল ভদ্র আচরণ। এটাই তাদের বড় অধিকার । এ ক্ষেত্রে গণমাধ্যম ব্যবহার করে বিল্‌সকে প্রচারণা চালাতে হবে যাত্রী, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, গ্যারেজ মালিকসহ সাধারণ মানুষের জন্য।

ভুল ধারণা দূর করতে প্রচারাভিযান: রিক্সা সেক্টর সম্পর্কে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের এবং সাধারণ মানুষের নেতিবাচক ধারণা তৈরি হচ্ছে। তবে এই সেক্টরের গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক দিকও রয়েছে। বিল্‌সকে সেই ইতিবাচক দিক ফোকাস করতে হবে।

ব্যাপক নীতি প্রণয়ন: রিক্সা সেক্টরকে আধুনিকায়ন ও উন্নয়নের জন্য বিল্‌সকে সরকারের নীতি নির্ধারকদের সাথে কাজ করতে হবে।

কর্মসূচি সম্প্রসারণ করা: দেশের বিভিন্ন বিভাগীয় এবং জেলা শহরে বিল্‌স এর কর্মসূচিকে সম্প্রসারণ করে রিক্সাচালকদের বিষয়ে জনমত গড়ে তুলতে হবে।

৬. কর্তৃপক্ষের জন্য সুপারিশ

বিল্‌স এর প্রধান ভূমিকা রিক্সাচালকদের সংগঠিত করা এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে অ্যাডভোকেসি করা। রিক্সা সেক্টরের উন্নতি ও শ্রম অধিকার এবং কল্যাণ নির্ভর করে প্রধানতঃ এলজিআরডি, শ্রম মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ওপর। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশ করা যেতে পারে:

১) প্রতিটি কর্তৃপক্ষের জন্য প্রযোজ্য দিক নির্ধারণ করে একটি নীতিমালা প্রস্তুত করা।

২) সিটিজেন চার্টারে রিক্সা সেক্টর নীতি, সেবা ও সংশ্লিষ্ট সংস্থার অন্তর্ভুক্তিকরণ।

৩) রিক্সা সেক্টরের জন্য একটি ডেটাবেস তৈরি করা (ঢাকা শহর এবং সারা দেশ)।

৪) ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানে রিক্সাস্ট্যান্ড এবং পাশাপাশি হোটেল ও টয়লেট সুবিধা তৈরি করা।

৫) ঢাকা শহরের প্রধান রাস্তায় রিক্সার জন্য পৃথক লেন নির্মাণ এবং তা কঠোরভাবে কার্যকর করা।

৬) নতুন রিক্সা লাইসেন্স সরবরাহ করা এবং এই সেক্টরে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা।

৭) রিক্সা চালকদের জন্য ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান।

৮) ঢাকা শহরের রিক্সা চালকদের জন্য আবাসিক ব্যবস্থা করা।

৯) যুক্তিসংগতভাবে রিক্সা ভাড়া নির্ধারণ এবং তা প্রয়োগ করা।

১০) এই সেক্টরে আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা প্রবর্তন।

১১) এই সেক্টরে বিভ্রান্তিকর এবং বেআইনী সংগঠনের কার্যক্রম বন্ধ কওে দেয়া ।

১২) সরকারি হাসপাতালগুলোতে রিক্সাচালকদের সহজ চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা।

১৩) রিক্সা গ্যারেজ মালিকদের প্রযুক্তিগত এবং আর্থিক সহায়তা প্রদান করা উচিত যাতে তারা রিক্সাচালকদের ভাল সেবা প্রদান করতে পারে।

১৪) বিভিন্ন বিষয়ে রিক্সাচালকদের প্রশিক্ষণ প্রদান।

১৫) রিক্সা চালকদের জন্য ক্রেডিট ফান্ড গঠন।

১৬) রিক্সা চালকদের জন্য বীমা প্রকল্প (সাধারণ ও স্বাস্থ্য) চালু করা।

১৭) দুর্ঘটনায় ও অন্যান্য আর্থিক সহায়তায় রিক্সাচালকদের জন্য ডিসিসিতে একটি কল্যাণ তহবিল তৈরি করা।।

১৮) রিক্সার প্রতি নেতিবাচক মনোভাব মুছে ফেলার জন্য মিডিয়ার মাধ্যমে নাগরিকদের জন্য প্রচারণা।

১৯) গবেষণার মাধ্যমে যথাযথ মোটরাইজ্ড রিক্সার প্রচলন করা।

ভাষান্তর: মোঃ ইউসুফ আল-মামুন

পাট শিল্পের সংকট: উত্তরণে করণীয়

শহীদুল্লাহ চৌধুরী[১]

ভূমিকা

সুদীর্ঘ লড়াই সংগ্রামের ফলে ২০০৯ সালে বাংলাদেশের পাট শিল্পের সংকট দূর করতে কতিপয় ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। গড়ে তোলা হয় বিজেএমসির পরিচালনা পর্ষদ। পাট কলের অভিজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত পরিচালনা পর্ষদ তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে কতিপয় নীতিমালা গ্রহণ করে বিজেএমসির মিলগুলোর কিছুটা হলেও সংকট কাটিয়ে উঠে উৎপাদন চালু করে। তাদের তত্ত্বাবধানে এ শিল্পের সামগ্রিক অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়। যার ফলশ্রুতিতে ২০১০-১৩ সাল এই চার বছর শিল্পে সহনশীল অবস্থা ফিরে আসে এবং শ্রমিকদের মাঝে কোন অসন্তোষ ছিল না। তবে এই পরিচালনা পর্ষদ ছিল চুক্তিভিত্তিক। একদিকে চুক্তি অনুযায়ী তাদের মেয়াদ শেষ হয় অন্যদিকে পাট মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী পরিবর্তন হয়। পরিচালনা পর্ষদে চুক্তিভিত্তিক কর্মকর্তাদের স্থলাভিষিক্ত হন অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তাগণ। অনভিজ্ঞ এসকল কর্মকর্তাদের ভুল পরিকল্পনা, অপব্যয়, দূনীতি-লুটপাট এমনকি অনভিপ্রেত রাজনৈতিক হস্তক্ষেপও বৃদ্ধি পায়। শ্রমিক কর্মচারীদের মজুরী, অবসরপ্রাপ্তদের গ্রাচ্যুইটি, পিএফসহ সামগ্রিক পাওনা প্রদান করতে ব্যর্থ হয়। শ্রমিক-কর্মচারীদের জীবনে চরম অভাব অনটন নেমে আসে। মানবেতর জীবন যাপনে নিমজ্জিত শ্রমিক কর্মচারীরা নিজেদের বাঁচার তাগিদেই লড়াই-সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে বাধ্য হন।

২০০৯ সালের পরবর্তী সময়ে দায়মুক্ত হওয়া মিলগুলোর আবারও নানাবিধ সংকটের পুনরাবৃত্তি ঘটে। উৎপাদনও সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে আসে। গৌরবময় পাট শিল্পের পরিস্থিতি সমগ্র দেশবাসীকে হতাশাগ্রস্থ করে তোলে। বাংলাদেশের পাট ও পাটশিল্পের সম্ভাবনা কাজে লাগাতে সামগ্রিক বিষয়ের তথ্যভিত্তিক চিত্র নিচে তুলে ধরা হলো।

১) বাংলাদেশ জুট মিলস্ করপোরেশনের সর্বশেষ অবস্থা ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত:

- বিজেএমসির সর্বমোট মিলের সংখ্যা ৩২টি। এর মধ্যে চালু মিল ২২টি, ননজুট মিল ৩টি, বন্ধ মিল ১টি, এবং পুনঃগ্রহণকৃত মিল ৬টি যা মামলাজনিত কারণে বন্ধ রয়েছে। পুনঃগ্রহণকৃত মিল গুলো হলো ঢাকা জুট মিলস লিঃ, এ আর হাওলাদার জুট মিলস্ লিঃ, ফৌজি চটকল লিঃ, তাজ জুট বেকিং লিঃ, সুলতানা জুট মিলস্ লিঃ ও কো-অপারেটিভ জুট মিলস্ লিঃ।

---

১ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সভাপতি ও বিল্স উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য

- বিজেএমসির মোট তাঁত সংখ্যা ১০৮৩৫টি, চালু যোগ্য ৯৫৫২টি, অকেজো ১২৮৩টি।
- চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৩০ সেপ্টেম্বর '১৮ পর্যন্ত বিজেএমসির বাজেটেড তাঁত সংখ্যা ৭৭৩৪টি, এর মধ্যে চালু তাঁত আছে ৪৯৯১টি।
- সেপ্টেম্বর '১৮ মাসে বিজেএমসিতে কর্মরত কর্মকর্তা, কর্মচারী, শিক্ষক ও শ্রমিকসহ সর্বমোট জনবল ৩৫,৯৯২ জন।

বিজেএমসি'র সর্বমোট জনবল (২০১৮ পর্যন্ত)	
কর্মকর্তা	১,১৫৬
কর্মচারী	২,৩৩৬
শিক্ষক	১৩৯
শ্রমিক স্থায়ী	২০,৬০৮
বদলী	৬,১৬৯
সর্বমোট	**৩৫,৯৯২**

- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিজেএমসি'র পাটক্রয়ের নীট লক্ষ্যমাত্রা ১৭.৯০ কুইন্টাল। ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পাট ক্রয় করা হয়েছে ১.৫৮লক্ষ কুইন্টাল (৮.৮৩%) যার মোট মূল্য প্রায় ৭০.৯ কোটি টাকা। বিগত বৎসরের বকেয়াসহ বর্তমান মোট বকেয়ার পরিমান ৪৯৫.০ কোটি টাকা।
- চলতি ২০১৮-১৯অর্থবছরে ৩০ সেপ্টেম্বর '১৮ পর্যন্ত বিজেএমসি'র উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪২৩৩০ মে.টন। যার বিপরীতে উৎপাদন হয়েছে ২২৬৩৬ মে.টন(৫৩.৪৮%)।
- বিজেএমসি'র উৎপাদিত পণ্য হলো হেসিয়ান, স্যাকিং, সিবিবি এবং অন্যান্য বহুমূখী পণ্য যেমন ইয়ার্ণ, জিওজুট, বাস্কেট, ব্লাংকেট, ম্যাট, টেপ, পাট পাতার চা, সোনালী ব্যাগ ইত্যাদি।
- বিজেএমসি'র উৎপাদিত ননজুট পণ্য হলো স্ট্রবোর্ড, পেপার টিউব, জুট প্লাস্টিক সামগ্রী এবং পাট শিল্পে ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন যন্ত্রাংশ।
- চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বিজেএমসি'র রপ্তানীর লক্ষ্যমাত্রা ১৪১৮৯ মে.টন, যার মূল্য প্রায় ১৩২৩.১৬ কোটি টাকা। চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে (৩০সেপ্টেম্বর '১৮ পর্যন্ত) রপ্তানীর লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৩৫৪৭৪.২৫ টন, মূল্য প্রায় ৩৩০.৮১ কোটি টাকা। যার বিপরীতে অর্জিত হয়েছে ৬৯৫১.০৮ মে.টন যার মূল্য প্রায় ৬৯.৭৪ কোটি টাকা (৪৬.৬৭%)।

- বর্তমানে বিভিন্ন প্রকরণের পাটজাত পণ্য (৩০ সেপ্টেম্বর '১৮ পর্যন্ত) যেমন- হেসিয়ান, স্যাকিং, সিবিসি ও অন্যান্যসহ মোট মজুদের পরিমান ৭৬৭৭০.৯৩ মে.টন, যার মূল্য প্রায় ৭৪৭.২০ কোটি টাকা।
- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে (৩০সেপ্টেম্বর '১৮ পর্যন্ত) বিজেএমসি ই-ফাইলিং, কম্পিউটার এবং আধুনিক অফিস ব্যবস্থাপনাসহ অন্যান্য বিষয়ের উপর মোট ১২৪জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।
- বিজেএমসি পাট শিল্পকে আরও গতিশীল করার জন্য বর্তমানে ১৮টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে, তম্মধ্যে ৯টি সরকারি অর্থ্যায়নে, ৬টি বিজেএমসি'র নিজস্ব অর্থায়নে এবং ৩টি পিপিপিতে। ১৮টি প্রকল্পের মোট অর্থের পরিমান ৫১১০.৪ কোটি টাকা।
- বিজেএমসি'র ৩০ সেপ্টেম্বর '১৮ পর্যন্ত মোট দেনার পরিমান ২৫০৬.৬৫ কোটি টাকা।
- চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ৩০ সেপ্টেম্বর '১৮ পর্যন্ত বিজেএমসি'র ক্ষতির পরিমান ১৪৩.৭৩ কোটি টাকা (প্রভিশনাল)। গত ২০১৭-১৮অর্থবছরের ৩০ সেপ্টেম্বর '১৭ পর্যন্ত বিজেএমসি'র ক্ষতির পরিমান ছিল ১১৯.৮ কোটি টাকা (প্রভিশনাল)।

বাংলাদেশ ও ভারতের উৎপাদন ও রপ্তানি (আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক) (২০১০-২০১৬)

বাংলাদেশ

অর্থবছর	রপ্তানি					
	হেসিয়ান	স্যাকিং	সিবিসি	ইয়ার্ণ	অন্যান্য	মোট
২০১০-১১	২০.৯৪	৮৪.১১	৬.৫০	০	৬.৩০	১২৭.৮৫
২০১১-১২	২১.৭২	৯৩.২৭	৩.৯০	০	৭.৮৯	১২৬.৭৮
২০১২-১৩	৩০.০৮	১২৯.৬৬	৮.১২	০	১১.৫৪	১৭৯.৪০
২০১৩-১৪	২৮.৮৮	৩৩.২৮	১০.১১	০	১৩.১৫	৮৫.৪২
২০১৪-১৫	৩১.৮৬	৬৮.৫২	৬.৮৮	০	১১.১২	১১৮.৩৮
২০১৫-১৬	১৫.২৬	৫৪.২৮	৭.২১	০	৮.৩৬	৮৫.২১
%(+/−) ২০১০-১১ ২০১৫-১৬	- ২৭.১৩	- ৩৫.৪৭	+ ১২.৪৬	০	+ ৩২.৭০	-২৭.৭০

আভ্যন্তরীণ ব্যবহার						সর্বমোট রপ্তানী ও আভ্যন্তরীন
হেসিয়ান	স্যাকিং	সিবিসি	ইয়ার্ণ	অন্যান্য	মোট	
৩.৮৬	১৭.৩৯	১.৮৮	০	৩.৪৩	২৬.৫৬	১৪৪.৪১
২.৫৪	৯.৬০	১.৪৩	০	৩.১৪	১৬.৭১	১৪৩.৪৯
২.৭৭	২১.৫০	১.৫৯	০	২.১৭	২৮.০৩	২০৭.৪৩
১.৫৪	২৯.৯২	২.৫০	০	২.৯৭	৩৬.৯৩	১২২.৩৫
৩.৪৩	১৮.১২	২.৬৫	০	১.৯৭	২৬.১৭	১৪৪.৫৫
৯.১৬	২৯.০৯	২.৭২	০	৩.৪৭	৪৪.৪৪	১২৯.৬৫
+১৩৭.৩১	+ ৬৭.২৮	+ ৪৪.৬৮	০	+ ১.১৭	+ ৬৭.৩২	- ১০.২২

ভারত

অর্থবছর	রপ্তানি					
	হেসিয়ান	স্যাকিং	সিবিসি	ইয়ার্ণ	অন্যান্য	মোট
২০১০-১১	৫২.১০	৫৪.১০	৩.৪০	৭১.৫০	৬.২০	১৮৭.৩০
২০১১-১২	৫৬.৪০	৯৩.৯০	২.৫০	৫৯.৭০	৫.৭০	২১৮.২০
২০১২-১৩	৪১.২০	৮৪.৭০	১.৯০	৩৫.৫০	৫.২০	১৬৬.৫০
২০১৩-১৪	৪৪.৩০	৮৬.৯০	২.৫০	৩৭.৮০	৬.৭০	১৭৮.২০
২০১৪-১৫	৩৩.৪০	২৬.০০	২.৩০	৩৬.৭০	৬.৯০	১০৫.৩০
২০১৫-১৬	৩৪.৬০	১৭.৫০	২.৪০	২১.০০	৬.০০	৮১.৫০
%(+/−) ২০১০-১১ ২০১৫-১৬	- ৩৩.৫৯	- ৬৭.৬৫	- ২৯.৪১	- ৭০.৬৩	- ৩.২৩	- ৫৬.৪৯

আভ্যন্তরীণ ব্যবহার						সর্বমোট রপ্তানি ও আভ্যন্তরীণ
হেসিয়ান	স্যাকিং	সিবিসি	ইয়ার্ণ	অন্যান্য	মোট	
১৭৭.৪০	১০০৪.৪০	০.৮০	৭৭.৫০	৫১.৪০	১৩১১.৫০	১৪৯৮.৮০
১৮৫.০০	১১২৫.০০	১.২০	৭১.৩০	৪৬.৪০	১৪২৮.৯০	১৬৪৭.১০
১৫৬.৬০	১১৪৪.৭০	০.৭০	৬৮.৫০	৪৪.২০	১৪১৪.৭০	১৫৮৩.২০
১৬০.৭০	৯০৯.৪০	০.৪০	৬৯.২০	৫৮.৯০	১১৯৮.৬০	১৩৭৬.৮০
১৭৩.০০	৯০১.৪০	০.৩০	৫৭.৩০	৫১.৭০	১১৮৩.৭০	১২৮৯.০০
১৫৬.৭০	৮৫১.৪০	০.৯০	৩৭.৩০	৪৪.৪০	১০৯০.৭০	১১৭২.২০
- ১১.৬৭	- ১৫.২৩	+১২.৫০	- ৫১.৮৭	- ১৩.৬২	- ১৬.৮৪	-২১.৭৯

বাংলাদেশ জুট স্পিনার্স এসোসিয়েশন
বছরভিত্তিক বাংলাদেশি পাটপণ্য ও কাঁচা পাট রপ্তানি
(পরিমানঃ টন/লক্ষ বেল (কাঁচা পাট), মূল্যঃ কোটি টাকায়)

	২০০১-২০০২		২০০২-২০০৩		২০০৩-২০০৪		২০০৪-২০০৫	
	পরিমান	মূল্য	পরিমান	মূল্য	পরিমান	মূল্য	পরিমান	মূল্য
বিজেএস এ	১৮৩,৬২৫	৫৫৮.০০	১৮৯,৬৭৯	৫৮৪.০০	২১৯,৩৩৪	৬২৫.০০	২৫১,৮৩২	৯৫৬.০০
বিজেএমসি	২১৫,৫৯১	৬৪২.৪২	১৬৬,৪১১	৫২৩.১১	১৩৮,৭১৯	৪৩৮.৫৯	১২১,৯৪১	৩৯২.৯২
বিজেএমএ	৩০,৯০১	১১০.৫৫	৩২,৮৬০	১২১.১১	৩৯,৩০০	১৩৫.৩৫	৩২,৮০০	১৩৫.০০
মোট	৪৩০,১১৭	১৩১০.৯৭	৩৮৮,৯৫০	১২২৮.২২	৩৯৭,৩৫৩	১১৯৮.৯৪	৪০৬,৫৭৩	১৪৮৩.৯২
বিজেএ	১৪,১১	৩৭৫.০০	২৫.১৯	৫১৮.০০	১৯.০৫	৪৫৫.০০	১৭.০৪	৫৬৩.০০
মোট		১৬৮৫.৯৭		১৭৪৬.২২		১৬৫৩.৯৪		২০৪৬.৯২

	২০০৫-২০০৬		২০০৬-২০০৭		২০০৭-২০০৮		২০০৮-২০০৯	
	পরিমান	মূল্য	পরিমান	মূল্য	পরিমান	মূল্য	পরিমান	মূল্য
বিজেএসএ	২৬১,৪৩৮	১১৬২.০০	২৮৫.৪৯৯	১৩৩৫.১৯	৩৩৭,৪৮২	১৫৮১.৬১	৩০৪,০৫৬	১৪৯৭.৯৩
বিজেএমসি	১২৮,৬২৩	৫০৪.৪৭	১০১,২৩৬	৪৩৫.২০	১০২,০৩৬	৪৮৭.০০	৮৮,৬২৮	৪২৯.৭৫
বিজেএমএ	৭০,৭৭৩	৩৪৬.০০	৭৭,৫১৫	৩৮৬.০৯	৮৫,৫৫৬	৪৪০.৪০	৮০,৭১৬	৪২৯.৯৮
মোট	৪৬০,৮৩৪	২০১২.৪৭	৪৬৪,২৫০	২১৫৬.৪৮	৫২৫,০৭৪	২৫০৯.০১	৪৭৩,৪০০	২৩৩৯.৬৬
বিজেএ	২৪.৪৭	৯৭৭.০০	২৪.৪৩	৯১৪.১৫	২৮.৭১	১০৩৩.৪০	১৭.৪৯	৯২১.০০
মোট		২৯৮৯.৪৭		৩০৭০.৬৩		৩৫৪২.৪১		৩২৬০.৬৬

	২০০৯-২০১০		২০১০-২০১১		২০১১-২০১২		২০১২-২০১৩	
	পরিমান	মূল্য	পরিমান	মূল্য	পরিমান	মূল্য	পরিমান	মূল্য
বিজেএসএ	৩৮০,৩৩৫.৭৭	২৫৪৮.৭৩	৩৯৪,৩৮৯.৬৮	৩৩৯৬.১৭	৪৫৮,২১০.২৭	৩৩৬৭.০২	৫১৬,২৫২.০০	৩৪৯৬.২৬
বিজেএমসি	১০৪,৪১৮.২৮	৬৪৩.৭৫	১৪১,৬৩৩.৭১	১২২১.৯৬	১২৩,৫৯৯.০০	১০২৮.৩৫	১৭৭,০৩৭.০০	১৩৬৩.১৯
বিজেএমএ	১১৩,৬০৪.০০	৭৪৬.১৪	৮২,১৭৮.০০	৬৮১.৫২	১১৩,৯৮৩.০০	৯১৯.৭৬	১৪৮,৪২৭.০০	১১১৪.৩১
মোট	৫৯৮,৩৫৮.০৫	৩৯৩৮.৬২	৬১৮,২০১.৩৯	৫২৯৯.৬৫	৬৯৫,৭৯২.২৭	৫৩১৫.১৩	৮৪১,৭১৬.০০	৫৯৭৩.৭৬
বিজেএ	১৫.৬৮	১১৩০.৮৪	২১.১২	১৯০৬.৭৬	২২.৮৬	১৫৪০.৬৬	২২.৫৫	১৪৩৬.৪৫
মোট		৫০৬৯.৪৬		৭২০৬.৪১		৬৮৫৫.৭৯		৭৪১০.২১

	২০১৩-২০১৪		২০১৪-২০১৫		২০১৫-২০১৬		২০১৬-২০১৭	
	পরিমান	মূল্য	পরিমান	মূল্য	পরিমান	মূল্য	পরিমান	মূল্য
বিজেএসএ	৫৫৯,৩৭৮.৫৯	৩৪৭৪.৩৩	৫৪৩,৪৬৯.৩৭	৩৬৭৫.০৬	৫৫১,৩৩৪.৫৫	৪০২৯.৮১	৫৫৮,৭০৫.৩৯	৪৩৮১.৪০
বিজেএমসি	৮৫,১৩৩.০০	৬২৮.৭৮	১১৭,৯৫২.০০	৮১২.০৬	৮৫,২১৭.৭৫	৬৫৬.৫১	৮৭,৭৯২.০০	৭৮৫.৫৮
বিজেএমএ	১৪৫,২৬৫.০০	৯৫৯.২৫	১৫৪,৮৭০.০০	১১২১.৯২	১৮৯,২৪০.০০	১৪৫১.৭৮	১৯৯,০৫৭.০০	১৬২২.৬০
মোট	৭৮৯,৭৭৬.৫৯	৫০৬২.৩৬	৮১৬,২৯১.৩৭	৫৬০৯.০৪	৮২৫৭৯২.৩০	৬১৩৮.১০	৮৪৫,৫৫৪.৩৯	৬৭৮৯.৫৮
বিজেএ	৯.৮৪	৭০৬.০৫	১০.৪৯	৮১৬.৭৪	১১.৩৮	১০৫৪.৪০	১৬.৩৯	১৩৪২.৭২
মোট		৫৭৬৮.৪১		৬৪২৫.৭৮		৭১৯২.৫০		৮১৩২.৩০

	২০১৭-২০১৮	
	পরিমান	মূল্য
বিজেএসএ	৫৬৬,৩৫৮.১৩	৪৬৫০.৮৭
বিজেএমসি	৮৫,৯০০.৭৭	৮২৯.২২
বিজেএমএ	১৭৯,৯৬৯.০০	১৫৪৩.৬৬
মোট	৮৩২,২২৭.৯০	৭০২৩.৭৫
বিজেএ	১৩.৮০	১২৯৪.৬৫
মোট		৮৩১৮.৪০

বাংলাদেশের পাট এবং সংশ্লিষ্ট তথ্যাবলী

১) পাটচাষাধিন ভূমির পরিমান	ঃ	১৪.৭৫ লক্ষ একর প্রায়
২) গড় উৎপাদন	ঃ	৭৮ লক্ষ বেল (১.৪০মিলিয়ন টন)
পূর্বতন জের	ঃ	৯ লক্ষ বেল (০.১৬মিলিয়ন টন)
মোট	ঃ	৮৭ লক্ষ বেল (১.৫৬ মিলিয়ন টন)
৩) আভ্যন্তরীণ ব্যবহার	ঃ	৬১ লক্ষ বেল (১.১২মিলিয়ন টন)
৪) কাঁচা পাট গড় রপ্তানি এবং মূল্য	ঃ	১৪.০০ লক্ষ বেল (০.২৫মিলিয়ন টন) মূল্য ১১৯৯ কোটি টাকা।
৫) জুট মিলের সংখ্যা	ঃ	বি জে এস এ অধিন ৯৪টি (১২টি বন্ধ)
		বি জে এম এ অধিন ১৬৫টি (৪২টি বন্ধ)
		বি জে এম সি অধিন ২৬টি (১টি বন্ধ)
		মোট ২৮৫টি (৫৫টি বন্ধ)

৬) মিলগুলোতে কর্মরতদের সংখ্যা	ঃ	বি জে এস এ	ঃ	৭৫,০০০
		বি জে এম এ	ঃ	৬৬,০০০
		বি জে এম সি	ঃ	৬৩,০০০
		মোট সংখ্যা	ঃ	২,০৪,০০০
৭) পাট পণ্যের গড় উৎপাদন	ঃ	বি জে এস এ	ঃ	৫,৫৩,০০০ মে.টন
		বি জে এম এ	ঃ	২,৮৩,০০০ মে.টন
		বি জে এম সি	ঃ	২,১২,০০০ মে.টন
		মোট	ঃ	১০,৪৮,০০০ মে.টন
৮) আভ্যন্তরীণ ব্যবহার	ঃ	বি জে এস এ	ঃ	২৫,০০০ মে.টন (ইয়ার্ণ, টোয়াইন)
		বি জে এম এ	ঃ	৭৫,০০০ মে.টন (স্যাকিং, হেসিয়ান)
		বি জে এম সি	ঃ	৩৭,০০০ মে.টন (স্যাকিং, হেসিয়ান)
		মোট	ঃ	১,৩৭,০০০ মে.টন

৯) বৈদেশিক রপ্তানি এবং মূল্য	ঃ	বি জে এস এ	ঃ	৫,৫৫,০০০ মে.টন	৪২০৫ কোটি টাকা
		বি জে এম এ	ঃ	১,৯৪,০০০ মে.টন	১৫৩৬ কোটি টাকা
		বি জে এম সি	ঃ	৮৭,০০০ মে.টন	৭২০ কোটি টাকা
		মোট	ঃ	৮,৩৬,০০০ মে.টন	৬৪৬১ কোটি টাকা

১০) স্পিনিং মিলে টাকুর সংখ্যা ঃ ২,৪৯,০৩৬টি স্থাপিত যার মধ্যে ১,৯৫,০৫৫ টি চালু রয়েছে।

১১) পাটকলে তাঁতের সংখ্যা	ঃ	বি জে এম সি	ঃ	হেসিয়ান ৬২৩২ চালু রয়েছে ২৬০০টি
				স্যাকিং ৩৬৯৬ চালু রয়েছে ২৫৩৫টি
				সিবিসি ১০০০ চালু রয়েছে ৩৯৩টি
				অন্যান্য ৯৫ চালু রয়েছে ২০টি
				মোট ১১০২৩টি চালু রয়েছে ৫৫৪৮টি
		বি জে এম এ	ঃ	হেসিয়ান ৬৫১০ চালু রয়েছে ২২৩৬টি
				স্যাকিং ৮১৭৫ চালু রয়েছে ৩২৭০টি
				সিবিসি ৮৩১ চালু রয়েছে ৭০টি
				অন্যান্য ৪৯৫ চালু রয়েছে ২০০টি
				মোট ১৬০১১টি চালু রয়েছে ৫৭৭৬টি

* বিজেএসএ : বাংলাদেশ জুট স্পিনার্স এসোসিয়েশন (ব্যক্তিমালিকানাধিন)
* বিজেএমএ : বাংলাদেশ জুট মিলস্ এসোসিয়েশন (ব্যক্তিমালিকানাধিন)
* বিজেএমসি : বাংলাদেশ জুট মিলস্ করপোরেশন (রাষ্ট্রায়াত্ত্ব)
* সিবিসি : কার্পেট ব্যাকিং ক্লথ

** ১ একর = ০.৪০৫ হেক্টর, ১ বেল = ১৮০ কিলোগ্রাম, ১ মে.টন = ৫.৫৬ বেল

বিজেএমসি, বিজেএমএ এবং বিজেএসএ এর বছর ভিত্তিক পাট পণ্যের রপ্তানি

পরিমান : লক্ষ মে.টন

অর্থবছর	বিজেএমসি	বিজেএমএ	বিজেএসএ	মোট
১৯৮৩-৮৪	২.৯০	১.৮৫	০.২৮	৫.০৩
১৯৮৪-৮৫	২.৭২	১.৬৫	০.৩৬	৪.৭৩
১৯৮৫-৮৬	২.৭৭	১.৮৮	০.২৫	৪.৯০
১৯৮৬-৮৭	৩.০৪	১.৮০	০.৪৪	৫.২৮
১৯৮৭-৮৮	২.৫১	১.৭৪	০.৫৫	৪.৮০
১৯৮৮-৮৯	৩.০১	১.৬৭	০.৪৯	৫.১৭
১৯৮৯-৯০	৩.২৬	১.৬৬	০.৬৩	৫.৫৫
১৯৯০-৯১	১.৭৬	১.৪৭	০.৭০	৩.৯৩
১৯৯১-৯২	২.৭৪	১.৭০	০.৭৭	৫.২১
১৯৯২-৯৩	২.৯৩	১.১৬	০.৮৪	৪.৯৩
১৯৯৩-৯৪	২.৫৫	০.১৮	০.৯২	৩.৬৫
১৯৯৪-৯৫	২.৭৭	১.০৪	১.০৩	৪.৮৪
১৯৯৫-৯৬	২.৭১	০.৭৭	১.০৫	৪.৫৩
১৯৯৬-৯৭	১.৯২	০.৯১	১.০৯	৩.৯২
১৯৯৭-৯৮	১.৬০	০.৭৬	১.১৬	৩.৫২
১৯৯৮-৯৯	২.২০	০.৭৯	১.৩০	৪.২৯
১৯৯৯-২০০০	২.০১	০.৬৭	১.৪৪	৪.১২
২০০০-০১	২.২৩	০.৪২	১.৬১	৪.২৬
২০০১-০২	২.১৫	০.৩১	১.৮৩	৪.২৯
২০০২-০৩	১.৬৬	০.৩৩	১.৮৯	৩.৮৮

২০০৩-০৪	১.৩৮	০.৩৯	২.১৯	৩.৯৬
২০০৪-০৫	১.২২	০.৩৩	২.১৫	৪.০৬
২০০৫-০৬	১.২৯	০.৭০	২.৬১	৪.৬০
২০০৬-০৭	১.০১	০.৭৭	২.৮৫	৪.৬৩
২০০৭-০৮	১.০২	০.৮৫	৩.৩৭	৫.২৪
২০০৮-০৯	০.৮৮	০.৮০	৩.০৪	৪.৭২
২০০৯-১০	১.০৪	১.১৪	৩.৮০	৫.৯৮
২০১০-১১	১.৪১	০.৮২	৩.৯৪	৬.১৭
২০১১-১২	১.২৪	১.১৪	৪.৫৮	৬.৯৬
২০১২-১৩	১.৭৭	১.৪৮	৫.১৬	৮.৪১
২০১৩-১৪	০.৮৫	১.৪৫	৫.৫৯	৭.৮৯
২০১৪-১৫	১.১৮	১.৫৪	৫.৪৩	৮.১৫
২০১৫-১৬	০.৮৫	১.৮৯	৫.৫১	৮.২৫
২০১৬-১৭	০.৮৮	১.৯৯	৫.৫৯	৮.৪৬
২০১৭-১৮	০.৮৬	১.৮০	৫.৬৬	৮.৩২

উপরোক্ত অবস্থার আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশ জুট স্পিনার্স এসোসিয়েশনের অধিনস্থ ৮টি কারখানা নিয়ে যাত্রা শুরু করে বর্তমানে ৯৫টি কারখানায় উন্নীত হয়েছে। বর্তমানে এ শিল্পে ৭৫ হাজার শ্রমিক কর্মরত রয়েছেন। এ শিল্পের উদ্যোক্তাদের সাফল্যের ফলে ২০০১-০২ অর্থবছরে ১,৮৩,৬২৫মে. টন রপ্তানি বর্তমানে ৫,৬৬,৩৫৮.১৩ মে.টন এ উন্নীত হয়েছে। যার আর্থিক মূল্যমান ৪,৬৫০কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা।

বাংলাদেশ জুট মিলস্ এসোসিয়েশনের অধিনস্থ ৩৪টি কারখানা বর্তমানে ১৬২টি কারখানায় উন্নীত হয়েছে তবে ৩৪টি কারখানা বন্ধ রয়েছে। ৭০ হাজার শ্রমিক কর্মরত রয়েছেন। এ শিল্পের মালিকরাও চরম সংকট কাটিয়ে ২০০১-০২ অর্থবছরের ৩০,৯০১ মে.টন রপ্তানিকে বর্তমানে ১,৭৯,৯৬৯ মে.টনে উন্নীত করতে সক্ষম হয়েছেন। যার রপ্তানী মূল্যমান ১,৫৪৩কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা।

বাংলাদেশ জুট এসোসিয়েশন আভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরন করার পরেও গত বছর ১৩.৮০লক্ষ বেল রপ্তানি করতে সক্ষম হয়েছে। যার রপ্তানী আয় ১,২৯৪ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা।

বাংলাদেশ জুট মিলস্ করপোরেশন (বিজেএমসি) ২০০১-০২ অর্থবছরে ২,১৫,৫৯১ মে.টন রপ্তানি করে আয় করেছিল ৬৪২ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা। এই রপ্তানি কমে গিয়ে

২০১৭-১৮ অর্থবছরে দাঁড়িয়েছে ৮৫,৯০০.৭৭ মে.টন যার রপ্তানী মূল্য মাত্র ৮২৯ কোটি ২২ লক্ষ টাকা যা অপরাপর সকল এসোসিয়েশনের চেয়ে অনেক অনেক কম।

বাংলাদেশের প্রধান শিল্প ছিল পাট শিল্প। এই শিল্পের ছিল গৌরবোজ্জল ইতিহাস, ঐতিহ্য। এই শিল্পের সাথে গ্রোন্থিত এদেশের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, গণতন্ত্রের অধিকারের সংগ্রাম। বাঙালি জাতির প্রাণের তাড়না এ দেশের পাট শিল্প বিধায় এ দেশের কোন মানুষই এ শিল্পের ক্ষতি মেনে নিতে পারে না। সংকট নিরসনে কতিপয় মতামত তুলে ধরছি-

১) বিজেএমসির বর্তমান উৎপাদন, আভ্যন্তরীণ বিক্রি ও বৈদেশিক রপ্তানি আয়ের পরিমানের সাথে প্রশাসনিক কাঠামো সংগতিপূর্ণ নয় বিধায় সংস্কার সাপেক্ষে অভিজ্ঞ ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তিদের নিয়ে মূল কাঠামো পুণঃগঠন করা প্রয়োজন। প্রয়োজনের অতিরিক্ত বিভাগ যেগুলো রয়েছে তা সাময়িক বন্ধ করা সমীচিন। কাঠামোগত ব্যয় নূন্যতম ৩০ (ত্রিশ) শতাংশে কমিয়ে আনা আবশ্যক।

২) চালু কারখানাগুলোতেও কাঠামোগত সংস্কার প্রয়োজন। এনাম কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে গড়ে তোলা কাঠামো অপ্রয়োজনীয় বিধায় বিদ্যমান ৭টি পদের ৩টি কমানো আবশ্যক। সরকার ইতোমধ্যেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে মজুরী কমিশন বাস্তবায়ন করবেন, কিন্তু মিলগুলোর আর্থিক সামর্থ নেই। এক্ষেত্রে কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য উন্নত প্রযুক্তি গ্রহণের মাধ্যমে নতুন মেশিনারিজ ব্যবহার অতীব জরুরী। এতে করে প্রতিজন শ্রমিক ২ বা ততোধিক মেশিন চালনা করতে সক্ষম হবেন। ফলে শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধি পাবে কিন্তু আপেক্ষিক হারে উৎপাদন খরচ বাড়বে না। উক্ত কাজ সম্পন্ন করতে ট্রেড ইউনিয়নগুলোকে দায়িত্বশীল হতে হবে, আইনগতভাবে স্বীকৃত কার্যক্রমের বাইরে মিলের কোন বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হতে পারবে না।

৩) মিল পরিচালনা ও ব্যবসা বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনায় রাজনৈতিক প্রভাব মুক্ত রাখতে হবে। এক্ষেত্রে সরকারের উচ্চ মহলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বিশেষভাবে কাম্য।

৪) ইতিমধ্যেই সরকার ১৮টি পাটকলকে আধুনিকায়ন করতে ৬(ছয়) হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের পরিকল্পনা করেছেন (৬টি বিজেএমসির নিজস্ব অর্থায়নে, ৩টি পিপিপি এবং ৯টি সরকারী অর্থায়নে)। সমগ্র তথ্য হতে প্রতীয়মান হয় যে ১৮টি মিলকে একসাথে আধুনিকায়ন করার উদ্যোগ সম্ভবপর নয় বরং ৫টি মিলকে দিয়ে কাজটি শুরু করে উন্নত প্রযুক্তি এবং একই মান সম্পন্ন কোম্পানির মেশিনারিজ ব্যবহার করে ধাপে ধাপে আধুনিকায়ন করতে হবে। আমরা সন্দিহান যে বিজেএমসিকে ২০০৯ সালের পরিনতির দিকে যেন নিয়ে যাওয়া না হয়। সে ক্ষেত্রে সরকারকে সতর্কতার সাথে অগ্রসর হতে হবে। উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক কার্যক্রম, এটা শুরু করতে হবে ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ দিয়ে এবং প্রথমে মিল সাইড উন্নত করতে হবে। এ ক্ষেত্রে যে

কোম্পানি মেশিনারিজ সরবরাহ করবে তাদের সাথে চুক্তির মাধ্যমে অন্তত ১০ বছর প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ সাপ্লাই এবং সার্ভিস অব্যাহত রাখতে হবে।

৫) পাট এবং পাট শিল্প সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বাংলাদেশে ২টি যুগান্তকারী আবিষ্কার রয়েছে। পাটের জেনোম কোড এবং সোনালী ব্যাগ সাধারণ জনগণের বোধগম্য নয়। এ ক্ষেত্রে আরো প্রয়োজনীয় গবেষক, গবেষণার সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে যাতে পাটের উন্নতর ব্যবহারের মাধ্যমে বিশ্ববাজারে প্রতিযোগীতায় সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হই। সে ক্ষেত্রে বাজেট বৃদ্ধি করতে হবে। সোনালী ব্যাগ উৎপাদন, বাজারজাত এবং ব্যবহারিক চাহিদা বৃদ্ধি করতে পারলে পাটের আরেক নতুন দ্বার উন্মোচিত হবে। যা কাজে লাগাতে মিলের ব্যবস্থাপনা পরিষদ এবং সিবিএ কে ঐক্যমতের ভিত্তিতে অগ্রসর হতে হবে। এক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা, কাঠামোগত ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং তা দক্ষতা, দৃঢ়তা ও স্বচ্ছতার সাথে প্রয়োগ করতে হবে।

উপসংহারঃ আমাদের প্রিয় রাষ্ট্রায়ত্ত্ব খাতের পাট শিল্প বিলুপ্ত করার কোন উদ্যোগ এ জাতি মেনে নেবে না। আমাদের সীমিত জ্ঞান দিয়ে বিশ্বাস করি যে উপরোক্ত সুপারিশের ভিত্তিতে কার্যক্রম সম্পন্ন করলে এ শিল্পের সংকট সমাধানের মাধ্যমে লোকসান কাটিয়ে লাভজনক করার দ্বার উন্মোচিত হবে। এ বিশ্বাসের ভিত্তি হলো অনেক প্রতিকূলতার মধ্যেও পাট পণ্যের বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের প্রাধান্য চলে এসেছে। ভারতের আন্তর্জাতিক বাজার এর অবনতিকে বাংলাদেশ সাফল্যের সাথে গ্রহণ করেছে। পাট শিল্পে শত প্রতিকূলতা মোকাবেলা করেও ১০ কোটি মার্কিন ডলার রপ্তানি হয়েছে যা ২০২১ সালের মধ্যে দ্বিগুণ করা সম্ভব। এ বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা জরুরি এবং সকলে মিলে বহুমাত্রিকভাবে এ দায়িত্ব পালন করা প্রয়োজন।

সূত্রঃ

১) মহা পরিচালক, পাট অধিদপ্তর

২) বাংলাদেশ জুট মিলস্ করপোরেশন (বিজেএমসি)

৩) বাংলাদেশ জুট মিলস্ এসোসিয়েশন (বিজেএমএ)

৪) বাংলাদেশ জুট স্পিনার্স এসোসিয়েশন (বিজেএসএ)

৫) বাংলাদেশ জুট এসোসিয়েশন (বিজেএ)

৬) ইন্ডিয়ান জুট মিলস্ এসোসিয়েশন (আইজেএমএ)

তৈরি পোশাক শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ: প্রত্যাশা ও বাস্তবতা

মোস্তাফিজ আহমেদ[১]

গার্মেন্টস সেক্টরের শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম যে মজুরি ঘোষণা করা হয়েছে তার জন্য যে বাস্তবতা ও প্রত্যাশা ছিল তা বিশ্লেষণ করা দরকার। এ ক্ষেত্রে বর্তমানে আমাদের করণীয় কি সেটাও নির্ধারণ করার প্রয়োজন রয়েছে।

কোন প্রেক্ষাপটে এই ৮ হাজার টাকা মজুরি ঘোষণা করা হল সেটা বুঝতে হলে একটু পেছন ফিরে দেখা দরকার। ২০১৬ সালের ডিসেম্বরে শ্রমিকরা যখন মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলন শুরু করলেন এবং সেখানে শ্রমিকরা তাদের ন্যূনতম জীবনমান নির্ধারণের জন্য ১৬ হাজার টাকা দাবি করলেন। এর প্রেক্ষাপটে কারখানা বন্ধ হল, শ্রমিক নেতাদেরকে গ্রেপ্তার করা হল। সার্বিক এই প্রেক্ষাপটটা ছিল ২০১৬ সালের ডিসেম্বরে। পরবর্তীতে ২০১৭ সালের প্রথম দিকে প্রায় ১৬০০ শ্রমিককে চাকরিচ্যুত করা হল। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে এই ১৬ হাজার টাকা মজুরির দাবির প্রতি সমর্থন একই সাথে আটক শ্রমিক এবং ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের মুক্তির জন্য বৈশ্বিকভাবে একটা চাপ তৈরি হল। এর প্রেক্ষাপটে একটা সময় মালিক পক্ষ থেকে বলা হল যে, হ্যাঁ তাদেরকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। তবে চাকরিতে ফিরিয়ে নেয়া হবে। কতজনকে ফিরিয়ে নেয়া হয়েছিল সে পরিসংখ্যান আমাদের কাছে নেই। এর পরবর্তীতে দেখা যায়, সমস্ত ফেডারেশন এবং গার্মেন্টস সেক্টরের শ্রমিকদের জোট ১৬ হাজার টাকা এবং কেউ কেউ ১৮ হাজার টাকার দাবি করলেন। সেই দাবিগুলোও ক্রমশ জনপ্রিয় হওয়া শুরু করল। সার্বিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে একটি নতুন মোড় দেখা গেল গার্মেন্টস সেক্টরের ক্ষেত্রে। মালিক পক্ষ থেকে মজুরি পুনঃনির্ধারণে জন্য যে প্রস্তাবনা দেওয়া হল সেটা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একটা নতুন দিক। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৮ সালের ৩১ জানুয়ারি প্রথম মজুরি বোর্ড গঠিত হল। বিভিন্ন সংগঠন এবং জোটগুলো তাদের নিজস্ব অবস্থান থেকে মজুরি বৃদ্ধির জন্য মজুরি বোর্ড এর কাছে প্রস্তাব পেশ করে। কিন্তু আগের যে প্রস্তাব সেটা দেয়ার এখতিয়ার ছিল কেবলমাত্র শ্রমিক প্রতিনিধির (মজুরি বোর্ডের) এবং মালিকপক্ষের প্রতিনিধির। সেই প্রস্তাবটা এলো জুলাই মাসের তৃতীয় বৈঠকে। সর্বশেষ ১৩ সেপ্টেম্বর মজুরি বোর্ড থেকে গার্মেন্টস শ্রমিকদের নিচের স্তর সপ্তম গ্রেডের জন্যে ৮০০০ টাকা মজুরির একটা ঘোষণা দেওয়া হল।

---

১ সহকারী অধ্যাপক, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

২০১৬ থেকে আজকে পর্যন্ত ৮০০০ টাকা মজুরি ঘোষণার যে প্রেক্ষাপট সেই জায়গাগুলোতে আমাদের প্রশ্ন করা দরকার। সকলের কাছে প্রশ্ন মজুরি আদৌ কি বাড়ল? বাড়লে কত টাকা বাড়ল? আমাদের যে দাবি সেই দাবির সাথে প্রয়োজনীয় সামঞ্জস্যতা কতটুকু? বৃদ্ধিকৃত মজুরির সামঞ্জস্যতা কতটুকু? মোটাদাগে হিসাব করলে দেখা যায় যে ৮০০০ থেকে ৫৩০০ বিয়োগ করলে যেটা বাড়ে সেটাই মজুরি বৃদ্ধি। পত্রপত্রিকাগুলোতে সেভাবেই এসেছে এবং বলা হয়েছে ৫১% মজুরি বেড়েছে। সার্বিকভাবে চিন্তা করলে এটা ২৭০০ টাকা মজুরি বৃদ্ধি নাকি ৮৯৯৭ টাকা মজুরি বৃদ্ধি? এই প্রশ্ন কিন্তু চলেই আসছে। কারণ ২০১৩ সালে মজুরি বৃদ্ধির প্রস্তাব এবং মজুরি বোর্ড এর যে মজুরি বৃদ্ধির ঘোষণা সেখানে সুস্পষ্টভাবে বলা ছিল যে প্রতি বছর ৫% হারে মজুরি বাড়বে। ২০১৩ সালের ডিসেম্বর মাসে মজুরি কার্যকর হলে তার পর থেকে সেটা ৫% হারে বাড়তে থাকে। সর্বশেষ ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে যখন থেকে নতুন মজুরি কার্যকর হওয়ার কথা সেই সময় ৭১০২ টাকা মজুরি হওয়ার কথা। সেই হিসেবে মজুরি বৃদ্ধিটা ৮৯৭ টাকার মত বৃদ্ধি পেয়েছে বলে হিসাবে দেখা যায়। আসলে ৫১% মজুরি বৃদ্ধির বদলে ১২.৬৪% মজুরি বৃদ্ধিই বলা উচিত। যখনই মজুরির আলোচনা আসে তখনই আমরা শ্রমিক পক্ষ বা শ্রমিক পক্ষের প্রতিনিধিদের থেকে জানতে চাই মূল মজুরিটা আসলে কত হবে? আমরা সকলেই জানি যে গার্মেন্টস্ সেক্টরে প্রচুর ওভারটাইম হয়। এবং ন্যূনতম মজুরি যেটা গার্মেন্টস্ সেক্টরে আছে সেটা দিয়ে ন্যূনতম জীবনমান অর্জন সম্ভব হয় না বিধায় শ্রমিকরা ওভারটাইম করতে আগ্রহী হয়। সেখান থেকেই বেসিক এর অনুপাতটা কমে যায়। শ্রমিকের সুবিধা অর্থাৎ ওভারটাইম কাজ থেকে বাড়তি ইনকামের যে সুযোগ সে সুযোগটা তাদের জন্য সীমিত হয়। একই প্রেক্ষাপটে ফল হল দুটো। একটা তাৎক্ষণিক ফল (ওভারটাইম এর উপরে) এবং দীর্ঘমেয়াদী ফল। তার চাকরি শেষে যে সুবিধাগুলো পাওয়ার কথা সেই পরিমানটাও আসলে কমে আসে। সুতরাং মজুরির ক্ষেত্রে মূল মজুরি (গার্মেন্টস্ সেক্টরের জন্যে) একটা গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। সেক্ষেত্রে দেখা যায় মজুরি বৃদ্ধি হয়ে হয়েছে ৪১০০ টাকা। বেসিক ৩০০০ থেকে ১১০০ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। ৫% হল গেজেট অনুযায়ী মজুরি বৃদ্ধির হিসাব। মুদ্রাস্ফীতি এর দিকে না যাওয়াই ভাল কারন মুদ্রাস্ফীতির হার নিয়ে আমাদের অনেক দ্বিধা আছে। সরকারি পরিসংখ্যান একরকম বেসরকারী পরিসংখ্যান আরেকরকম।

সুতরাং মুদ্রাস্ফীতির পরিসংখ্যানের যে দুরত্ব সেটাকে অতিক্রম করার চিন্তা করে গেজেট অনুযায়ী ৫% মজুরি বৃদ্ধিকেও চিন্তা করলে দেখা যায় যেটা মূল মজুরি সেটা বৃদ্ধি পাচ্ছে ৭৯ টাকার মত। মূল মজুরি কিন্তু ২% এর বেশি বৃদ্ধি পায় নি। বাস্তবে ১.৯৯% মূল মজুরি বৃদ্ধি পেয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে যদি বিগত কয়েকটি সেক্টরের মজুরি ঘোষণা দেখি তাহলে দেখা যায় যে ধারাবাহিকভাবে শ্রমিকদের মূল মজুরি কমানোর একটা প্রবণতা

আছে। ২০১৮ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর ঘোষিত যে ন্যূনতম মজুরি ৭ম গ্রেডের জন্যে সেটাকে ২০১৩ সালের সাথে তুলনা করলে দেখা যাবে যে এখানে মজুরির বিভিন্ন উপাদান ঠিকই আছে। বাড়ি ভাড়া, চিকিৎসা ভাতা, যাতায়াত ভাতা এবং খাদ্য ভাতা ইত্যাদি জায়গাগুলোতে মূল মজুরি সবচেয়ে কম বৃদ্ধি করা হয়েছে। যদিও এটা মুদ্রাস্ফীতি সামঞ্জস্যপূর্ণ না স্পষ্টত ৩৬%। যেটা বাস্তবে ২%। তারপরও ৩৬% বেসিক এর জায়গায় খাদ্য ভাতার ক্ষেত্রে ৩৮% এবং চিকিৎসায় ১৪০% বৃদ্ধি করা হয়েছে। মূল মজুরি যেভাবে কমে এসেছে তা বিবেচনা করা দরকার। এক্স এক্সিজ এ যে ১,২,৩,৪,৫ সেটা আসলে বছরগুলোকে চিহ্নিত করছে। ১৯৯৪, তারপরে ২০০৬,২০১০,২০১৩,২০১৬। এর মধ্যে ২০০৬ সালে বেসিক এর শেয়ার সবচাইতে বেশি ছিল। মোট মজুরিতে যেটা ৭% এর মত। কিন্তু পরবর্তীতে ২০১০,২০১৩ এবং সর্বশেষ ঘোষিত ২০১৮ এর মজুরিতে কমতে কমতে এখন ৫১% এ নেমে এসেছে। (দ্রষ্টব্য: টেবিল-১)

টেবিল-১

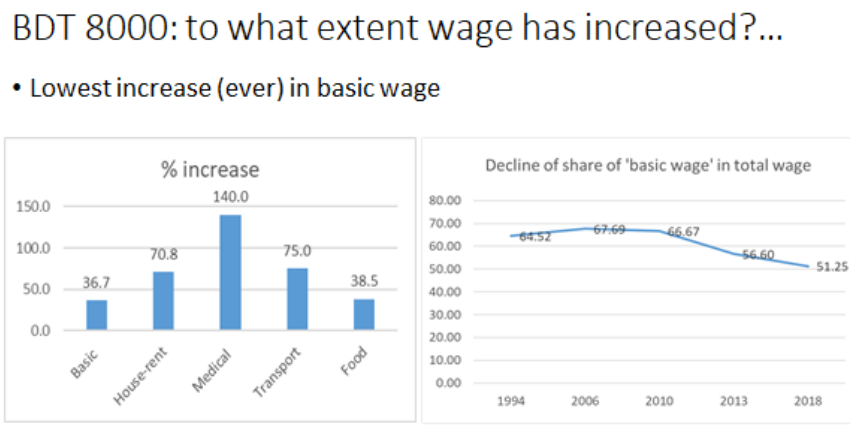

এই ধারাটাকে গার্মেন্টস সেক্টরে যারা আছেন, যারা মজুরি বোর্ড এর সদস্য ছিলেন এবং যারা মজুরি বোর্ড এ প্রস্তাবনা দিচ্ছেন সকলকেই আসলে বিবেচনায় নিয়ে আসতে হবে। এই ধারাটাকে বলা যেতে পারে মূল মজুরি কমানোর রাজনীতি। এই রাজনীতিটা খুঁজে বের করা দরকার। মূল মজুরি যে শুধুমাত্র কমছে তাই না সাম্প্রতিক সময়ে দেখা যায় প্রাতিষ্ঠানিক খাতের যে মজুরি ঘোষিত হয় সেই মজুরি ঘোষণায় অনেকগুলো সেক্টরের মধ্যে গার্মেন্টস সেক্টরে মূল মজুরিটা কম। যেখানে নির্মাণ সেক্টরে মোট ৭০% মূল মজুরি। প্লাস্টিক ইন্ডাস্ট্রিজে ৬৯% পর্যন্ত বেসিক আছে মজুরি কাঠামোর মধ্যে। সেখানে গার্মেন্টস

সেক্টরে (অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি) মজুরি বেসিক এর অনুপাতে ৫১% এ চলে আসছে। মজুরি বৃদ্ধির পরেও যদি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক অবস্থা দুইটাকে তুলনা করা হয় সেক্ষেত্রেও দেখা যায় যে গার্মেন্টস শ্রমিকরা কম মজুরি পান। (দ্রষ্টব্য: টেবিল-২)

টেবিল-২

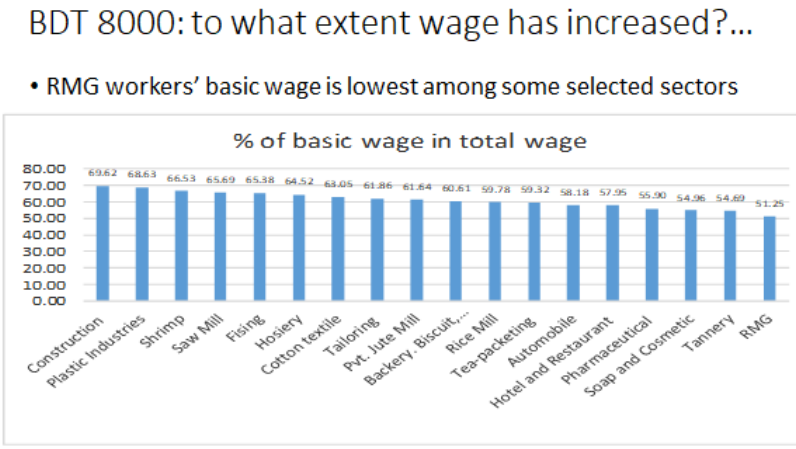

রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প কলকারখানায় শ্রমিকদের জন্য ঘোষিত ন্যূনতম মজুরি সর্বনিম্ন গ্রেডে যেটি মাত্র ১৪৪৫০ টাকা। ন্যাশনাল পে স্কেলেও সর্বনিম্ন স্তরে যিনি মজুরি পাচ্ছেন তিনিও ১৪২৫০ টাকা মজুরি পাচ্ছেন। ঘোষিত মজুরিকে এই দুইটি মজুরির সাথে তুলনা করলে দেখা যায় গার্মেন্টস শ্রমিকরা রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প করকারখানার শ্রমিকদের তুলনায় প্রায় ৪৫% মজুরি কম পাচ্ছেন। পে স্কেলের সর্বনিম্ন স্তরে যে মজুরিটা আছে সেই মজুরি থেকে ৪৪% মজুরি কম ঘোষণা করা হয়েছে। সরকারী খাত থেকে বের হয়ে বেসরকারী খাতের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় বেসরকারী খাতের মজুরি ঘোষণার প্রদ্ধতিই হচ্ছে নিম্নতম মজুরি বোর্ড। সর্বশেষ ২০১৮ সালের ঘোষিত মজুরিও লক্ষ্য করলে দেখা যায় জাহাজ ভাঙ্গায় ১৬০০০ টাকা এবং ট্যানারি শিল্পে ১২৮০০ টাকা ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা করা হয়েছে। এই একই বছরে গার্মেন্টস সেক্টরে ঘোষিত মজুরি ৮০০০ টাকা। অর্থাৎ গার্মেন্টস সেক্টরের সর্বনিম্ন স্তরের শ্রমিকের বেতন জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পে যিনি কাজ করবেন তার অর্ধেক। এবং ট্যানারি শিল্পে যিনি কাজ করছেন তার থেকে ৩৭.৫% মজুরি কম ঘোষণা করা হয়েছে গার্মেন্টস শিল্পের জন্যে। (দ্রষ্টব্য: টেবিল-৩)

টেবিল-৩

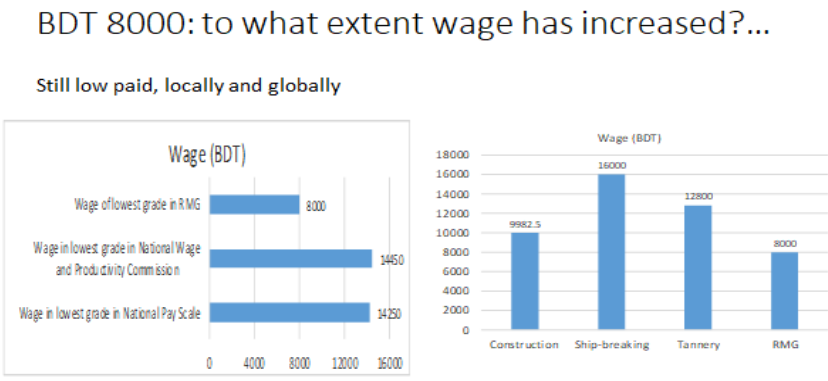

এখনও পর্যন্ত ভারত, পাকিস্তান, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়াসহ প্রত্যেকটি দেশের তুলনায় বাংলাদেশে মজুরি কম। ৮০০০ টাকাকে বিবেচনায় নিয়ে আসলেও সেটি আসলে কতটুকু জীবনযাপনের মান দিতে পারবে? ২০১৭ সালের অক্সফাম এর হিসাব অনুযায়ী জীবন ধারণের মজুরি ধারণার জায়গা থেকেও দেখা যাচ্ছে যে তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের গার্মেন্টস শ্রমিকদের মজুরি লিভিং ওয়েজ সবচাইতে কম যেটা ১৮%। শ্রীলংকায় ২০% এবং চীন ও ইন্দোনেশিয়ায় ন্যূনতম মজুরি লিভিং ওয়েজের ৬৬% এবং ৫৩% কাভার করছে। এই ১৮% হিসাবটা ছিল ৫৩০০ টাকা মজুরি হিসাব করে। বর্তমানে ৮০০০ টাকা মজুরিকে বিবেচনায় নিয়ে আসলে এটা গিয়ে দাঁড়ায় ২৭% এ। তারপরও কম্বোডিয়া, ভারত এবং চীনের তুলনায় অনেক কমই হবে বাংলাদেশের মজুরি। যেটা জীবনধারন উপযোগী হিসেবে খুবই প্রয়োজন। (দ্রষ্টব্য: টেবিল-৪)

টেবিল-৪

গার্মেন্টস শিল্পের জন্য ঘোষিত মজুরি এবং অন্যান্য সেক্টরের মজুরির সাথে তুলনা করা দরকার। শ্রমিকের প্রয়োজনকে চিন্তা করলে দেখা যায় যে বিল্স এর জরিপ থেকে আমরা কিছু মজুরির পরিমান পেয়েছি। এই মজুরির পরিমানটা ৫ সদস্যের একটা পরিবারে ন্যূনতম মানসম্মতভাবে বেঁচে থাকার জন্য ৩০২৬৮ টাকা, ৪ সদস্যের পরিবারের জন্যে ২৪৯৬৯ টাকা, শুধু স্বামী-স্ত্রী আছেন এমন দুইজনের জন্যে ১৭১২১ টাকা এবং যে একা শ্রমিক তারও ন্যূনতম ১২৪৩৮ টাকা প্রয়োজন। নারায়ণগঞ্জ, টঙ্গী, আশুলিয়া, মিরপুর, এফজিডি বা ফোকাস গ্রুপ আলোচনার মাধ্যমে আমরা এই তথ্যগুলো পেয়েছি। দেখা যাচ্ছে যে ৮০০০ টাকা যে হিসাব সেই ৮০০০ টাকা একজন শ্রমিকের ন্যূনতম প্রয়োজন পূরণের জন্যে ৬০%। পরিবারে দুইজন সদস্য থাকলে অর্ধেকেরও কম পূরণ করবে। ৪ সদস্যের পরিবারের ক্ষেত্রে সেটা তিন ভাগের এক ভাগ এবং ৫ সদস্যের পরিবারের জন্যে সেটা আসলে প্রায় ৭০% এবং ৩০% প্রয়োজন পূরণ হবে বর্তমান ঘোষিত মজুরিতে। এ জায়গাতে হয়তো একটা বিভ্রান্তি আছে। পরিবারের সদস্যের হিসাবটা কিভাবে হবে মজুরি হিসাবের জন্য?

বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশের দিকে যাচ্ছে, মাথা পিছু আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। যদি মাথা পিছু আয়ের হিসাবটাও নিয়ে আসা হয় তাহলে দেখা যাবে যে ১৭৫২ ডলার মাথা পিছু আয় বলা হচ্ছে। সেটা যদি হয় তাহলে মাথাপিছু আয় দাঁড়ায় ১২২২৭ টাকা। এই টাকাকে যদি গার্মেন্টস শ্রমিকের ঘোষিত মজুরির ৮০০০ টাকার সাথে তুলনা করা হয় তাহলে সেখানেও দেখা যায় প্রায় ৩৫% কম। মাথা পিছু আয়ের চেয়ে ৩৫% কম মজুরি ঘোষণা করা হয়েছে একজন পরিবারের জন্য। মজুরির জন্যে এমন চিন্তা করতে হবে যেন পরিবারের সদস্য নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে এবং তাদের মর্যাদা নিশ্চিত করতে পারে। গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিগুলো সবই শহর এলাকায়। শহর এলাকার একটা পরিবারের গড় আয় ২২৫৬৫ টাকা। এটাকে যদি ঘোষিত মজুরির সাথে তুলনা করা হয় দেখা যায় যে এটা ৮০০০ টাকা অর্থাৎ প্রায় তিন ভাগের এক ভাগের কাছাকাছি।

সার্বিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে মজুরি কিভাবে নির্ধারিত হল তা বিবেচনা করা দরকার। মজুরি নির্ধারণের কিছু জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক উপকরণ আছে। যদিও বাংলাদেশ আইএলও কনভেনশন ১৩১ ধারা অনুসমর্থন করে নি তারপরও শ্রম আইন ২০০৬ এ যে সমস্ত নির্ণায়ক নির্ধারণ করা আছে সেই নির্ণায়কগুলো আসলে আইএলও'র যে নির্ণায়কগুলো আছে সেগুলোকে অন্তর্ভূক্ত করে। শুধুমাত্র একটি উপাদান ছাড়া সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়টাকে আইএলও সুপারিশে নিয়ে আসা হয়েছে সামাজিক মজুরি নির্ধারণের একটা পদ্ধতি হিসেবে। কিন্তু বাংলাদেশের শ্রম আইনে এই প্রদ্ধতিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। তারপরও শ্রমিকের প্রয়োজন একটি সমাজের যেখানে মজুরি স্তর এবং কস্ট অব লিভিং প্রডাক্টিভিটি এই বিষয়গুলো আইএলও সুপারিশ এবং একই সাথে বাংলাদেশ শ্রম আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশ শ্রম আইনে যে উপাদানগুলোর কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে জীবনযাত্রার খরচ, উৎপাদন খরচ, উৎপাদশীলতা, পণ্যের দাম, ব্যবসায়িক ক্ষমতা ইত্যাদি। আসলে মোটা দাগে এই বিষয়গুলোকে যদি তিনটি গ্রুপে ভাগ করা যায় তাহলে কিছু আছে শ্রমিকের প্রয়োজন, কিছু আছে উৎপাদনের সাথে সম্পর্কিত এবং বাঁকি

যে উপাদান সেটা হচ্ছে দেশের সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থা। মাথা পিছু আয় বাড়ছে কিন্তু গার্মেন্টস শ্রমিকের মজুরি সেই গতিতে এগুচ্ছে না। আবার উৎপাদনশীলতার যে বিষয়টা আছে সেই বিষয়ে দেখা যায় যে এটা সবসময় মজুরি বৃদ্ধিতে সহায়ক হয় এরকম উদাহারণও নেই। বলা হচ্ছে যে কম্বোডিয়াতে ২০০০-২০১৩ সাল পর্যন্ত উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে ৭৬% এর মত, কিন্তু মজুরি ২০% এর বেশি বৃদ্ধি পায় নি। সুতরাং উৎপাদনশীলতাকে সবসময় যদি গুণক হিসেবে চিন্তা করা হয় তাহলে অনেক সময় পুঁজি আহরণের গড় হিসেবে চলে আসতে পারে। ২০১৬ সালের ডিসেম্বরে ১৬০০০ টাকা মজুরির দাবি থেকে শুরু করে বিভিন্ন আন্দোলন বিভিন্ন সংগ্রাম বিভিন্ন গোলটেবিল বৈঠকের বিভিন্ন প্রস্তাবনা সমস্ত কিছু থেকে আজকের এই অর্জন। এগুলো ৮০০০ টাকা মজুরি ঘোষণায় প্রশ্ন উত্থাপন করেছে ।

সুতরাং যে প্রশ্নগুলোর অবতারণা হচ্ছে সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে বের করা খুবই জরুরি। এটা হয়ত এবারের জন্যে চূড়ান্ত কোন সুবিধা দিতে পারবে না, কিন্তু ভবিষ্যতে যে আন্দোলন, সংগ্রাম, দাবি, সেই সাথে মজুরি বৃদ্ধির যে প্রয়াস সেই জায়গাগুলোতে কার্যকরী অবদান রাখার প্রয়োজন হলে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে নেওয়া প্রয়োজন। তার মধ্যে প্রথমেই আসে নিম্নতম মজুরি বোর্ডের গঠন প্রক্রিয়া। বিশেষ করে সেক্টর প্রতিনিধি নির্বাচনের যে বিধান আইনে আছে সেটার অনেক ক্ষেত্রেই সুস্পষ্ট কোন দিক-নির্দেশনা নেই। এই জায়গাতে অনেক ক্ষেত্রেই বলা হয়েছে "সরকারের মতে" । সুতরাং প্রভাব বিস্তারের সুযোগ সবসময় এই জায়গাতে থেকে যাচ্ছে। পরবর্তীতে মজুরি বোর্ডে মজুরি কিভাবে নির্ধারিত হচ্ছে? যদি দারিদ্র্য সীমা হিসাব করা হয় তাহলে একটা সময় ছিল ক্যালরি ইনটেক অর্থাৎ প্রতিদিন কত ক্যালরি ব্যয় করার দরকার হয় সেটার উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের দারিদ্র্য সীমাকে চিন্তা করা হত। সে জায়গা থেকে সরে এসে এখন আবার খানা জরিপে মৌলিক চাহিদা পদ্ধতির খরচে চলে যাওয়া হয়েছে। সুতরাং মজুরি হিসাবের জন্য মজুরি বোর্ড কোন প্রক্রিয়াটা অনুসরণ করছে, শ্রমিকের প্রয়োজন নির্ধারনের জন্যে এই বিষয়গুলো সুস্পষ্ট না। সুতরাং এই বিষয়ে আরো বেশি সচেতন হওয়া প্রয়োজন এবং এই বিষয়গুলো সম্পর্কে সুস্পষ্ট প্রস্তাবনা থাকা প্রয়োজন। আবার ক্যালরি ইনটেক ম্যাথড এ গেলেও আসলে সেটা কি দারিদ্র্য সীমার ক্যালরি ইনটেক নাকি শ্রমিকের কাজ করার জন্যে যেটা বেশি প্রয়োজন সেই ক্যালরিকে বিবেচনায় নেওয়া হবে সেই প্রশ্ন থেকেই যায়। ২১২২ কিলোক্যালরি, নাকি ২৪০০ ক্যালরি, নাকি ৩০০০ কিলোক্যালরি এই যে বিতর্কগুলো আছে এই বিতর্কগুলো নিয়েও সিদ্ধান্তে আসা প্রয়োজন। আবার পরিবারের সাইজ এর ক্ষেত্রেও একটা বড় ধরনের মাত্রা চলে এসেছে। সেটা হচ্ছে নির্ভরশীল সদস্য কতজন হিসাব করা হবে? প্রশ্নটা হল ৫ সদস্য, ৬ সদস্য, নাকি ২ সদস্যের পরিবার হিসাব করা হবে? একটা সময় ছিল যখন একাই একজন পরিবারের জন্য আয় করত। তখন তার একার আয়ে পরিবারে সহায়তা করা প্রয়োজন নাকি দুজন আর্নারের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া প্রয়োজন এই বিষয়গুলোর ব্যাপারে সিদ্ধান্তের প্রয়োজন। বহুল ব্যবহৃত কিছু আন্তর্জাতিক মান, আন্তর্জাতিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছে যেখানে নির্ভরশীল সদস্যের হিসাব আছে। কিন্তু বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে চিন্তা করলে সেই পদ্ধতিতে যাওয়া যায় কি না সেটাই বড় প্রশ্ন। কারণ এখনও পর্যন্ত মজুরি হিসাবের যে

প্রক্রিয়া তাতে গত পে-কমিশনের সময় দেখেছি যে ৬ সদস্যের পরিবারের প্রয়োজন বিবেচনা করা হয়েছে। পরিবারের সংজ্ঞার জায়গাতেও কাজ করার সুযোগ আছে। সুতরাং জাতীয় বেতন স্কেলে ৬ সদস্যের পরিবার ধরে এবং জাতীয় মজুরি ও উৎপাদনশীলতা কমিশনে যদি মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে নির্ভরতার অনুপাত বিবেচনা করা না হয় তাহলে গার্মেন্টস এর ক্ষেত্রে এটা বিবেচনা করা হবে কি হবেনা সে বিষয়ে সিদ্ধান্তের প্রয়োজন রয়েছে। সেক্ষেত্রে বার বারই গার্মেন্টস মালিকদের পক্ষ থেকে বলা হয় যে দুজন কাজ করে, তিনজন কাজ করে। সরকারি যে চাকরি সেখানে যদি স্বামী-স্ত্রী কাজ করে তাও দুজনই বেতন পায় সেখানে হিসাব করা হয় না। আমরা যেখানে কাজ করি সেখানে একজন পরিবারের যতজনই কাজ করচক না কেন তখন হিসাব করা হয় না যে কতজন নির্ভরশীল এবং কতজন স্বনির্ভর। প্রত্যেককেই তার পূর্ণ মজুরি দেওয়া হয় এবং তার পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণ করার হিসাবটা করে দেওয়া হয়। সুতরাং শ্রমিকের ক্ষেত্রে এই বিষয়টা আসবে কি না সে বিষয়ে অবস্থান সুস্পষ্ট করা প্রয়োজন।

আরেকটি বিষয় হল খাদ্য ভাতা মূল মজুরি কাঠামোর মধ্যে আসবে কিনা সেটা নিয়েও দ্বিমত আছে। খাদ্য ভাতাকে যদি আলাদা করা হয় তাহলে মূল মজুরির হিসাবটা কিভাবে করা হবে? খাদ্য ভাতাকে বাদ দিয়ে মূল মজুরি হিসেব করা হচ্ছে কি না? খাদ্য ভাতা অবশ্যই মূল মজুরির মধ্যে আসবে এবং অবশ্যই মূল মজুরি বৃদ্ধি করবে। সেই জায়গাতে এই যে মাত্রাগুলো এবং এই খাদ্য ভাতাকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রবণতা রয়েছে। এই জায়গাগুলোতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে আসা প্রয়োজন। মজুরি বোর্ডের নিরপেক্ষ প্রতিনিধি নির্বাচন প্রক্রিয়াও যেমন আইনে দ্ব্যর্থক সেই সাথে নিরপেক্ষ প্রতিনিধির ভূমিকাও সুনির্দিষ্ট করা হয় নি। আইনেও হয়নি, বিধিতেও হয়নি। এই জায়গাতেও ফোকাস করা প্রয়োজন। নিরপেক্ষ প্রতিনিধি মজুরির একটা প্রস্তাব দিতে পারে। এবার নিরপেক্ষ প্রতিনিধির কোন প্রস্তাব এর কথা শোনা যায় নি। অনেক সময় দুই পক্ষের যে প্রস্তাবনা থাকে সেখানে দ্বিমত হয় তাহলে নিম্নতম মজুরি বোর্ড সরেজমিনে তদন্ত করতে পারে, ফিল্ডে গিয়ে প্রয়োজন পরিমাপ করতে পারে। এবারের মজুরি বোর্ডের ক্ষেত্রে এরকম কোন উদ্যোগ ছিল বলে জানা নেই। এই প্রশ্নগুলো সামগ্রিক মজুরি নির্ধারণের যে প্রক্রিয়া তার মধ্যেই থেকে যায়। মজুরি ৮০০০ টাকা বা ৭০০০ টাকা যাই হোক না কেন মজুরি যদি ৫৩০০ টাকা থেকে ৬০০০ টাকাও বৃদ্ধি পায় তাহলে শ্রমিকের জন্যে কিছু হুমকির সৃষ্টি হয়। যেটা এর আগে দেখা গেছে। সুতরাং মজুরি বৃদ্ধির সাথে সাথে ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষ থেকে বিষয়গুলোকে খুব গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত এবং এই বিষয়ে নীতি নির্ধারণ করা উচিত। সুতরাং একজন শ্রমিককে যতটুকু মজুরি দেওয়া হয় তার বিনিময়ে শ্রমিকের উপর যে শোষণ করা হয় সেই বিষয়েও সচেতন থাকা উচিত। শ্রমিক ছাঁটাইয়ে বিষয়টা এখানে চলে আসে। মজুরি বৃদ্ধির সাথে সাথে বাড়ি ভাড়া, শ্রমিক যে সমস্ত এলাকায় বসবাস করে সেই এলাকায় নিত্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য জিনিসের যে দাম সেই দাম বৃদ্ধির বিষয়টাও নজরে আনা উচিত। এরকম অনেক অভিযোগ শ্রমিক করেন যে তাদের কাছ থেকে বেশি মূল্য রাখা হয়। সাধারণ একজন মানুষের কাছে একটা ঔষধের যে মূল্য রাখা হয় গার্মেন্টস শ্রমিকের কাছে তার থেকে এক/দুই টাকা বেশি রাখা

হয়। এরকম অভিযোগ শ্রমিকরা মাঝে মাঝেই করে থাকে। তাই সামগ্রিকভাবে এই বিষয়গুলো আলোচনায় নিয়ে আসা উচিত।

সামগ্রিক যে মজুরি সেই মজুরির ক্ষেত্রে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক লক্ষ্য অর্জণ করা দরকার। সেই লক্ষ্যগুলোর সাথে এই মজুরির একটা সম্পর্ক আছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে ২০৩০ সালের মধ্যে। এই লক্ষ্যমাত্রার অর্জনের ক্ষেত্রে দারিদ্র্যমুক্ত, ক্ষুধামুক্ত, স্বাস্থ্যসম্মত, মানসম্মত শিক্ষা, লিঙ্গবৈষম্য ইত্যাদি অর্জন করতে চাইলে অবশ্যই একটা মানসম্মত মজুরির ভূমিকা অপরিহার্য। টেশসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার যে ১৭টি গোল তার মধ্যে ৯টি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মজুরির সাথে কোন না কোনভাবে জড়িত। বাংলাদেশের জাতীয় পর্যায়ে যে সমস্ত উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা যেমন ভিশন ২০২১, সপ্তম-পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যে উন্নয়নের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে সে জায়গাতেও কর্মক্ষম প্রজন্ম, দ্রুত দারিদ্র্য দূরীকরণের কথা বলা হয়েছে। টেকসই মানব উন্নয়ন অর্জন করতে চাইলে মজুরি ছাড়া এটা আসলে কতটুকু অর্জিত হবে এই প্রশ্ন থেকেই যায়। পার্সপেক্টিভ প্ল্যান যেখানে আছে সেখানেও সকলের ক্ষেত্রে শিক্ষার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং মজুরি এমনভাবে নির্ধারণ করতে হবে যেন শ্রমিক তার সন্তানের শিক্ষা নিশ্চিত করতে পারে। মানসম্মত খাদ্য এবং তার প্রয়োজনীয় পুষ্টি পূরণ করতে পারে। মজুরি থেকে এই বিষয়টি অর্জন করা খুবই জরুরি।

গার্মেন্টস্ শ্রমিকের মজুরি কেন গুরুত্বপূর্ণ? এটি টেকসই লক্ষ্যমাত্রা ও জাতীয় উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্র অর্জন করার জন্যে গুরুত্বপূর্ণ। আমরা উৎপাদনশীল কর্মীর কথা বলি, উৎপাদন বৃদ্ধির কথা বলি কিন্তু সেখানে যদি মানসম্মত মজুরি নির্ধারণ সম্ভব না হয় তাহলে সেই উন্নয়ন লক্ষ্যগুলো অর্জন করা সম্ভব না। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে শ্রম বাজারের কথা চিন্তা করলে দেখা যা যে ৬ কোটি ৮ লক্ষ শ্রমিক যারা কোন না কোন কর্মের সাথে জড়িত। দেখা যায় যে প্রতি ১৪ জনে ১ জন গার্মেন্টস এ কাজ করে। সুতরাং টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে চাকরি সম্পর্কিত যে গোলগুলো আছে এই ১৪ জনের একজনকে বাদ দিয়ে সেই লক্ষ্যগুলো অর্জন করা সম্ভব নয়। এটাই মূল আলোচ্য বিষয়। এ জায়গাতেই সুচিন্তিত মতামত প্রয়োজন যে কি করা যেতে পারে? ট্রেড ইউনিয়নের বর্তমান প্রেক্ষিতে যে মজুরি ঘোষণা করা হয়েছে সেটির ক্ষেত্রে আপিল এর সুযোগ আছে। বাংলাদেশের শ্রম আইনের বিধানে বলা আছে যে মজুরি বোর্ড যখন সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠাবে তখন সরকার সেই প্রস্তাব পাওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে যদি কোন পক্ষের আপত্তি দেওয়ার সুযোগ থাকে এবং সরকার যদি ন্যায়সঙ্গত মনে না করে তাহলে সরকারকে বোঝানো একটা চ্যালেঞ্জ। আর সেই চ্যালেঞ্জটা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে নিতে হবে যাতে করে সরকারের পক্ষ থেকে মজুরি বোর্ডে ফেরত পাঠানোর কোন ব্যবস্থা করা যায় যে এটার পুণঃপরীক্ষা প্রয়োজন। একই সাথে আন্তর্জাতিক সংহতিও গুরুত্বপূর্ণ। মজুরি বৃদ্ধির সাথে শুধুমাত্র যে মালিক পক্ষের ভূমিকা বা শ্রমিক পক্ষের ভূমিকা আছে তা না এখানে একটা দরকষাকষির প্রচেষ্টারও প্রয়োজন আছে। সেক্ষেত্রে যদি ট্রেড ইউনিয়নের প্রেক্ষিতে চিন্তা করা হয় তাহলে দেখা যায় যে বিশ্বব্যাপী গ্রাহক সচেতনতা এখন একটা বড় উপাদান। সে জায়গাতে ট্রেড ইউনিয়ন কাজ করতে পারে।

সম্প্রতি অক্সফাম এর গবেষণাতে অস্ট্রেলিয়ায় ১০০০ গ্রাহকের উপর জরিপ করে দেখা গেছে যে ৯০% গ্রাহক শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধির জন্যে বেশি দামে পণ্য কিনতে তারা রাজি। সুতরাং এই জায়গাগুলোতে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। মালিককে অবশ্যই শ্রমিকের প্রয়োজন অনুধাবন করতে হবে এবং তাদের মূল্য নির্ধারণের আলোচনার ক্ষমতার জায়গাতে ফোকাস করতে হবে। বিশেষ করে মজুরি বৃদ্ধির কারণে মালিক পক্ষ থেকে যে অভিযোগটা করা হয়, যে আশংকার কথা বলা হয় সেগুলো। কারখানা বন্ধ হলে তখন কি হবে?

বিজিএমইএ এর ওয়েবসাইট থেকে যে তথ্য পাওয়া গেছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে ১৯৯৪ সালে মজুরি ঘোষণা করার পর ১৯৯৫ সালে কোন কারখানা বন্ধ হয়নি। বরঞ্চ ১৭১ কারখানা বৃদ্ধি পেয়েছিল। ২০০৬ সালে মজুরি ঘোষণা করা হলে পরবর্তীতে ২০০৭ সালে ২৫৩ টার বেশি কারখানা বৃদ্ধির বিষয়টি ঐ বিজিএমই এর ওয়েবসাইটের হিসাবেই আছে। ২০১০ সালে মজুরি ঘোষণা করা হল কিন্তু তখনকার তুলনায় ২০১১ সালে বিজিএমই এর ওয়েবসাইটেই ২৫০ টির বেশি কারখানার হিসাব আছে। ২০১৩ সালে মজুরি ঘোষণা করার পর ২০১৪ সালে বিজিএমই এর ওয়েবসাইটেই ৭৪ টি কারখানা বেশি দেখানো আছে। সুতরাং মজুরি বৃদ্ধিজনিত কারণে কারখানা বন্ধ হওয়ার যে আশংকা সেটি কতটুকু মূলক নাকি অমলূক বিবেচনা করা উচিত। আসলে ব্রান্ডদের একটা প্রতিশ্রুতি থাকা প্রয়োজন যে ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধি করলে তারা পন্যের মূল্য বৃদ্ধি করবে। ব্র্যান্ডসদের ক্ষেত্রে ক্রয়ের চর্চা একটা বড় ফ্যাক্টর। সেই দায়িত্বশীল ক্রয়ের চর্চা প্রয়োজন।

ব্র্যান্ডসরাও যে ন্যূনতম মজুরির ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করতে পারে সেটা কম্বোডিয়া বা মায়ানমারের যে উদাহারণগুলো আছে সেখান থেকে শেখার সুযোগ আছে। এই ঘোষিত মজুরি পুনর্বিবেচনা করার ব্যাপারে সরকারের কাছে দাবি থাকবে। সরকারের দিক থেকে পর্যবেক্ষণ যখন বাস্তবায়নে যাবে তখন এর লেভেল এ গিয়ে রিট্রেসমেন্ট এবং উৎপাদন টার্গেট বৃদ্ধির জায়গাগুলোতেও শক্তিশালী পর্যবেক্ষণ এর ব্যবস্থা থাকতে হবে। সামাজিক নিরাপত্তা স্কীম এর ক্ষেত্রে আরও বেশি ফোকাস করা উচিত। একটা স্থায়ী পদ্ধতি করা যায়। আসলে প্রতিবারই দেখা যায় যে একেকটা দুর্ঘটনা ঘটে আর তার পরই মজুরি বৃদ্ধির উদ্যোগগুলো নেওয়া হয়। তাই সরকারের দিক থেকে একটা স্থায়ী পদ্ধতি তৈরি করা প্রয়োজন যেটা শুধুমাত্র মজুরি ইস্যুতে কাজ করবে।

অনুলিখন: মোঃ মাসুম রহমান
সম্পাদনা: মামুন অর রশিদ
গত ৩ অক্টোবর, ২০১৮ বিল্‌স আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠকে মোস্তাফিজ আহমেদ কর্তৃক উপস্থাপিত

টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা ও বাস্তবতা

মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম[১]

বহুল চর্চ্চিত ও আলোচিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা অর্জনের সাথে শ্রমিকের আর্থিক সক্ষমতা লাভের একটি যোগসূত্র রয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে যে ১৭টি লক্ষ্য ও ১৬৯টি সাব-টার্গেট অর্জনের লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে তা বর্তমান বিশ্ব ও বাংলাদেশের প্রেক্ষিত বিবেচনায় কতটুকু অর্জনযোগ্য? এসডিজি'র ১ নং লক্ষ্য দারিদ্র্য বিমোচন থেকে শুরু করে বাকি ১৬টি লক্ষ্যই কোন না কোনভাবে মানুষের আর্থিক অবস্থার সাথে সম্পর্কিত। তবে পুঁজি ও মুনাফা নিয়ন্ত্রিত বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়- বাংলাদেশও যার উত্তরাধিকার বহন করে চলেছে- সেখানে শ্রমিকের আর্থিক সক্ষমতা লাভের সুযোগ বা সম্ভাবনা কি আদৌ আছে? শ্রমিকের আয় কত টাকা হলে তাকে আর্থিকভাবে সক্ষম হিসেবে ঘোষণা করা হবে? বাস্তবে এমন দিন কি আসবে যখন শ্রমিক শ্রেণি প্রকৃতই আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হবে? বিশ্ব মোড়লরা অবশ্য একটি উত্তর নির্ধারণ করে রেখেছেন, সেটি হচ্ছে- ২০৩০ সালেই; অর্থাৎ আজ থেকে মাত্র ১১ বছর! সত্যিই কি সম্ভব?

'অর্থনৈতিক উন্নয়ন' আর 'আর্থিক অবস্থার উন্নতি'- বিষয় দুটি সম্পর্কিত হলেও কিন্তু ভিন্ন। অর্থনৈতিক শব্দটি নীতির সাথে সম্পর্কিত, আর আর্থিক অবস্থা কেবলই পুঁজি ও মুনাফাভিত্তিক। আবার 'উন্নয়ন' শব্দটি সমষ্টি মানুষের জীবনমানের ইতিবাচক পরিবর্তনকে নির্দেশ করে, বিপরীতে 'উন্নতি' বিষয়টি ব্যক্তি মানুষের আর্থিক অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তনকে নির্দেশ করে। একজন ব্যক্তি মানুষ লুটপাট বা চুরি-ডাকাতি বা অন্যের শ্রম শোষণ করেও পুঁজি জমিয়ে, পুঁজি খাটিয়ে মুনাফা অর্জন করে অনেক অনেক অর্থবিত্তের মালিক হতে পারে। কিন্তু সমষ্টি মানুষের পক্ষে এভাবে পুঁজি জমানো কঠিন, তাই সমষ্টি মানুষকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করতে চাইলে রাষ্ট্রকে অর্থনৈতক পরিকল্পনা নিয়ে এগোতে হয়- এখানে নীতি-নৈতিকতার কিছুটা সংশ্লিষ্টতা আছে বৈকি।

এখন দেখা যাচ্ছে যে, যে মানুষের কথাই আমরা আলোচনা করি না কেন, অথবা অর্থনৈতক উন্নয়ন বা আর্থিক অবস্থার উন্নতি- যাই বলি না কেন সেগুলো সবই রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়। একটি সহজ প্রশ্ন সামনে আনা যাক- আমি বা আপনি বা একজন শ্রমিক বা একজন দরিদ্র মানুষ- দরিদ্র কেন? মানুষ কি তার গতজন্মের কর্মফলের কারণে দরিদ্র? দরিদ্র পরিবারে জন্ম নেয়ার কারণে দরিদ্র? ভালো আয় না করতে পারার কারণে দরিদ্র? শিক্ষাদীক্ষা করতে না পারায় ভালো চাকুরি থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণে দরিদ্র?

---

১ উন্নয়নকর্মী, ইমেইল: cdanazrul@gmail.com

কর্মসংস্থানের সুযোগ পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়ে বেকার থাকার কারণে দরিদ্র? নাকি সংবিধানের অঙ্গীকার অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় সম্পদের সুষম বণ্টন না হওয়ার কারণে দরিদ্র? নাকি দেশের জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করতে না পারার রাষ্ট্রীয় ব্যর্থতার কারণে মানুষ দরিদ্র? নাকি দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, নীতি ও পরিকল্পনা যথাযথ না হওয়ার কারণে মানুষ দরিদ্র? নাকি দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার কারণে মানুষ দরিদ্র?

এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে আমাদেরকে বিশ্ব ও বাংলাদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, জেন্ডার, পরিবেশ ইত্যাদি প্রেক্ষিত সম্পর্কে এবং এদের মধ্যে আন্তঃসম্পর্কের বিষয়গুলো অনুধাবণ করতে হবে। দেখা যাচ্ছে, রাজনৈতিক ক্ষমতা বা প্রভাব কাজে লাগিয়ে মানুষ আর্থিক মুনাফা লাভ করছে, আবার আর্থিকভাবে শক্তপোক্ত মানুষজন উড়ে এসে রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রে জুড়ে বসছে। আবার, রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতাবান ও আর্থিকভাবে ধনী লোকগুলো সামাজিক ক্ষেত্রেও প্রভাব বাড়ানোর সুযোগ পাচ্ছে। আবার, সাংস্কৃতিক কারণে মানুষের প্রতিবাদহীনতার সুযোগ নিয়ে যুগ যুগ ধরে শোষিত ও বঞ্চিত মানুষের ঘাড়ে পা রেখে মুনাফাখোরগণ সম্পদ বাড়িয়ে যাচ্ছে কিংবা রাজনৈতিক নেতারা ক্ষমতা করায়াত্ত্ব করছে; একটা ভয়ের সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করে মানুষকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন থেকে দূরে রাখা হচ্ছে। আবার, জেন্ডার বা মানুষে মানুষে সম্পর্ক- যথা- নারী ও পুরুষের সুযোগ ও ক্ষমতার তারতম্য, অঞ্চল ভেদে মানুষ মানুষের মধ্যে সুযোগ ও ক্ষমতার তারতাম্য, সুস্থ ও প্রতিবন্ধি মানুষের মধ্যে তারতম্য, ধর্মের বিভিন্নতার কারণে মানুষে মানুষে পার্থক্য ইত্যাদি বিষয় মানুষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব ও মর্যাদা নির্ধারণে ভূমিকা রাখে। আর, সবশেষে পরিবেশ- যথা জলবায়ু পরিবর্তন, নদী ভাঙন, খরা, অতিবৃষ্টি ইত্যাদির প্রভাবে মানুষের দরিদ্র হয়ে যাওয়ার প্রবণতা দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও নেতিবাচক প্রভাব রাখে; তবে এই ধরনের পরিস্থিতি থেকেও লুটেরা ও ধনবান শ্রেণি ফায়দা লুটে নেয়।

এখন দেখা যাক- একজন নাগরিক এবং নাগরিক হিসেবে একজন শ্রমিক নিজে নিজে তার অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন করা্র ক্ষেত্রে কতটুকু কি করতে পারে। যে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের অর্থসম্পদে শ্রমিকের প্রবেশাধিকার নেই, অর্থাৎ ব্যাংকে হাজার হাজার কোটি টাকা অলস পড়ে থাকলেও দরিদ্র মানুষকে ঋণ দেওয়ার রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সহায়ক নয় (অথচ ধনিক শ্রেণি হাজার হাজার কোটি টাকা ঋণ নিয়ে পরিশোধ করে না!), কোটি কোটি মানুষ ব্যাংকে কেবল আমানত রেখে গেলেও মাত্র উপরের দিকের কিছু মানুষকে ব্যাংকঋণ মঞ্জুর করা হয়; বিশাল বিশাল আর্থিক প্রকল্প নেওয়া হয়- তুলনায় দরিদ্র মানুষকে সম্পৃক্ত করে ছোট ছোট প্রকল্প কমই নেওয়া হয়। আবার, কৃষক-শ্রমিক 'উৎপাদক শ্রেণি' হলেও উৎপাদনের মুনাফা লাভ থেকে তারা বঞ্চিত। কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করছে মুনাফাখোর ফড়িয়াগোষ্ঠী, আর শ্রমিকের উৎপাদিত পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করছে আন্তর্জাতিক চক্র! কৃষক-শ্রমিক নিজেই আজ পণ্যে পরিণত; আর এদের মধ্যে নারীর কথা বলাই বাহুল্য। কৃষক-শ্রমিকের হাতে যতোই টাকা বেশি আসুক, সেই টাকা কেড়ে নেওয়ার জন্য বসে আছে বাড়িওয়ালা আর ব্যবসায়ীরা- যারা আবার বিশ্ব ও দেশের

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতারও অংশীজন। এই এক অবিরাম চক্র চলছে বহুদিন ধরে।

এটা নিশ্চিত যে, বিশ্বের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নীতি-সিদ্ধান্তের পরিবর্তন না হলে, রাষ্ট্র কর্তৃক প্রকৃত জনকেন্দ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ না করলে বিশ্ব, দেশ ও সমাজ থেকে অর্থনৈতিক অসাম্য তথা দারিদ্র্য দূরীকরণ কেবল একটি পরিকল্পনা হিসেবেই টিকে থাকবে- সেক্ষেত্রে ২০৩০ এর পর আমরা আরেকটি চমৎকার সাল-সংখ্যার উল্লেখ দেখতে পাব মাত্র- এর বেশি কিছু হয়তো নয়।

কর্মক্ষেত্রে মানসিক স্বাস্থ্য

মৌসুমী নিশাত[১]

১. ভূমিকা:

স্বাস্থ্য একটি সমন্বিত বিষয় এবং সুস্বাস্থ্যের জন্য মানসিক সুস্থতা অপরিহার্য। আর্থসামাজিক নানা কারণে বিশ্বব্যাপি বিষণ্নতা (Depression) ও উদ্বেগ (Anxiety) বৃদ্ধি পাচ্ছে যা মানসিক স্বাস্থ্য অবনতির অন্যতম কারণ হিসেবে বিবেচিত। মানসিক রোগ একটি গুরুত্বপূর্ণ অসংক্রামক ব্যাধি। আমাদের দেশে মানসিক রোগের কারণে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, পেশাগত ও সামাজিক জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। মানসিক স্বাস্থ্য সার্বিক স্বাস্থ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। মানসিক স্বাস্থ্য ছাড়া স্বাস্থ্যের সংজ্ঞা পরিপূর্ণ নয়। বিদ্যমান কুসংস্কার, ভ্রান্ত বিশ্বাস ও নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি মানসিক রোগ চিকিৎসার ক্ষেত্রে অন্যতম অন্তরায়। মানসিক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে সমাজে আত্মমর্যাদার সাথে বসবাসের সুযোগ তৈরি করা আমাদের সকলের দায়িত্ব। মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি ও মানসিক স্বাস্থ্যের সমর্থনে প্রচেষ্টা জোরদার করার লক্ষ্যে সারা বিশ্বে প্রতি বছর ১০ অক্টোবর বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস পালন করা হয়। মানসিক সমস্যার কারণে কর্মদক্ষতা হ্রাস পায় এবং সামগ্রিক উৎপাদনশীলতা ব্যাহত হয়।

সম্প্রতি আইসিডিডিআর,বি (ICDDR,B)[২]-এর একটি নিরীক্ষায় জানা যায় যে, বাংলাদেশে মানসিক সংক্রান্ত সমস্যাবলী মারাত্মক আকার ধারণ করেছে, কিন্তু এ বিষয়গুলো উপেক্ষিত। মানসিক সংক্রান্ত সমস্যাবলী যেমন বিষণ্নতা, উদ্বেগ, অ্যাডিকশন, সিজোফ্রেনিয়া, এবং স্নায়ুবিক পীড়া স্বাস্থ্যের ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে। আমাদের দেশে এ বিষয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্যাদি, সচেতনতা ও মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কর্মরত প্র্যাকটিশনারদের অপর্যাপ্ততা রয়েছে। মানসিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার স্বার্থে এ সমস্যাগুলো দূর করা প্রয়োজন। উক্ত নিরীক্ষায় বাংলাদেশের প্রাপ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠীর ৬.৫ থেকে ২১ শতাংশ লোকের মাঝে মানসিক সমস্যাবলী যেমন বিষন্নতা, উদ্বেগ ও স্নায়ুবিক পীড়া এর উপস্থিতি পাওয়া গেছে। শহরে ঘনবসতি এলাকায় বসবাসরত এবং গরিব মানুষের মাঝে এ সমস্যাবলী বেশি মাত্রায় লক্ষ্য করা গেছে বলে উক্ত নিরীক্ষায় বলা হয়েছে।

একজন ব্যক্তির সার্বিক সুস্থতার জন্য মানসিক সুস্থতা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। মানসিকভাবে অসুস্থ একজন ব্যক্তি কখনই দেশ ও জাতির কল্যাণে অবদান রাখতে পারে না। দেশ ও

---

১ ইনটার্ন হিসেবে বিল্‌স এর তথ্য বিভাগে কর্মরত

২ The International Centre Diarrhoeal Disease Research Bangladesh, (International Health Research Organisation, Dhaka, Bangladesh).

জাতির সার্বিক উন্নয়ন ও চালিকা শক্তি হিসেবে দেশটির কর্মক্ষেত্র ও উৎপাদনশীলতা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে অবদান রেখে থাকে। আর এই উৎপাদনশীলতা নির্ভর করে কর্মীদের দক্ষতার উপর। মানসিক ভাবে অসুস্থ একজন কর্মী কখনই তার দক্ষতা কাজে লাগিয়ে কর্মোদ্যম হয়ে উঠতে পারে না। ফলাফল দেশের উৎপাদনে ঘাটতি হয়ে সার্বিক উন্নয়ন ব্যহত হয়। দেশের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রতিষ্ঠান, সমাজ ও দেশের উন্নয়নের লক্ষ্যে কর্মীদের মানসিক সুস্থতার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। তাই কর্মীর সার্বিক সুস্থতা, প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে দেশের সার্বিক উন্নয়নই কর্মক্ষেত্রে মানসিক স্বাস্থ্য এবং সুস্থতার মূল উদ্দেশ্য। এজন্য ২০১৭ সালের ২৫ তম বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবসের প্রতিপাদ্য 'কর্মক্ষেত্রে মানসিক স্বাস্থ্য' (Mental Health in the Workplace) বিশ্বজুড়ে সমাদৃত এবং গ্রহণযোগ্য হয়েছিল।

মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়টি উপেক্ষিত এবং অবহেলিত। মানসিক সুস্থতার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানানো এই লেখার অন্যতম একটি উদ্দেশ্য। কর্মক্ষেত্রে কর্মীর মানসিক স্বাস্থ্যকে অবহেলা এবং কর্মীর উপর মানসিক চাপের ফলে অপচয় হয় শ্রমঘণ্টা। এর প্রভাবে প্রতিষ্ঠান সঠিক উৎপাদন ও লক্ষ্য নির্ধারণে ব্যর্থ হয়। তাই কর্মক্ষেত্রে মানসিক সুস্থতার প্রয়োজনীয়তা এবং কর্মীর মানসিক অসুস্থতার ফলাফল সম্পর্কে সাধারণ ধারণা প্রকাশ করাই এই লেখার মূল উদ্দেশ্য।

২. মানসিক স্বাস্থ্য ও অসুস্থতা:

মানসিক অসুস্থতা এমন একটি অবস্থা যা একজন ব্যক্তির চিন্তাভাবনা, অনুভূতি বা মেজাজের উপর নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে। এই ধরনের পরিস্থিতিতে অন্যদের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং প্রতিদিন কাজ করার ক্ষমতাকেও নেতিবাচক ভাবে প্রভাবিত করতে পারে। অন্যদিকে, মানসিক স্বাস্থ্য বা সুস্থতা মানসিক বিকাশের একটি মাত্রা যেখানে মানসিক অসুস্থতার অনুপস্থিতি থাকে। ব্যক্তি মানসিক স্বাস্থ্যের দরুন একজন মানুষ ক্ষমতা অর্জন করে, যা তাকে নিজের সাথে এবং তার চারপাশে থাকা অন্যদের সাথে যুক্ত হতে এবং একাত্ম হতে সাহায্য করে। শুধু তাই নয়, এই দক্ষতার জোরে মানুষ তার জীবনের নানাবিধ চ্যালেঞ্জকেও গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। মানসিক স্বাস্থ্যের ধারণার সঙ্গে মানসিক দুর্বলতা বা অস্বাভাবিকতার কোনও সম্পর্ক নেই। মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়টিকে অত্যন্ত ইতিবাচক দিক দিয়ে বিচার করেছে 'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা' (WHO-World Health Organization)। তাদের মতে স্বাস্থ্য হল শরীর, মন এবং সমাজের ভাল দিকগুলোর মেলবন্ধন। এই ভাবনার সঙ্গে রোগ বা দুর্বলতার দিকটি যুক্ত নয়। WHO-আরও বলেছে যে, সুচিন্তার অধিকারী মানুষ তার দক্ষতা বাড়াতে সব সময়ই সচেষ্ট, এই দক্ষতাই তাকে জীবনের বিপর্যয়গুলো মোকাবিলা করে সুস্থ, স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে সাহায্য করে, উৎপাদনশীল কাজে সে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারে এবং নিজের গোষ্ঠী ও সমাজের জন্যও অবদান রেখে যেতে পারে।

আমাদের সকলকেই জীবনের কোনও না কোনও সময়ে সাময়িকভাবে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়। ব্যক্তিগত বা কর্মজীবনের চ্যালেঞ্জগুলোর মোকাবিলা করতে গিয়ে অনেক সময়েই মানসিক অবসাদ এবং উদ্বিগ্নতার শিকার হতে হয়। যখন আমরা দেখি আমাদের স্বাভাবিক কাজগুলো ব্যাহত হচ্ছে, তখনই মানসিক অসুস্থতার প্রশ্নটি সামনে আসে। শারীরিক সুস্থতার বিষয়ে আমাদের মনে একটা স্পষ্ট ধারণা ক্রমশই গড়ে উঠছে। এই ক্ষেত্রে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাপনের সঙ্গে যে অসুখগুলো জড়িয়ে রয়েছে, সে বিষয়ে আমরা যতটা সচেতন মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়ে ততটা সচেতন তো দেখা যায়ই না, বরং এ বিষয়ে কোন কথা বলাই যেন নিষেধ। বেশিরভাগ সময়েই মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক সমস্যাগুলো বিভিন্ন ধরনের ভুল ধারণার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে। এই ক্ষেত্রে মানসিক স্বাস্থের ধারণাটি পরিষ্কার হওয়া উচিত। মানসিক সমস্যা সমাধানের জন্য উপসর্গগুলিকে চিহ্নিত করে উপযুক্ত চিকিৎসা করলে সমস্যার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। অন্যান্য রোগের চিকিৎসার মতো এই রোগেরও চিকিৎসা রয়েছে। এই রোগ নিরাময়ের জন্য সাইকোথেরাপি এবং মেডিটেশনের সাহায্য নেওয়া হয়। ভারত সরকার মানসিক সমস্যাগুলিকে নন-কমিউনিকেবল অসুখ হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

মানসিক সমস্যার রূপগুলি নানা প্রকার। যেমন- অবসাদ, মানসিক উদ্বিগ্নতা, এছাড়াও রয়েছে সিজোফ্রেনিয়া এবং বাইপোলার সমস্যা।

৩. কর্মক্ষেত্রে মানসিক স্বাস্থ্যঃ

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO- World Health Organization) মতে, বিশ্বে ৩০০ মিলিয়নেরও বেশি মানুষ বিষণ্নতায় ভুগছে যার প্রভাব পরছে স্বাভাবিক কর্মদক্ষতা ও উৎপাদনশীলতার উপর। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশেও মানসিক রোগের প্রকোপ দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। কর্মক্ষেত্রে শারীরিক স্বাস্থ্যের পাশাপাশি মানসিক স্বাস্থ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

কর্মক্ষেত্রে মানসিক স্বাস্থের উন্নয়নে স্বাস্থ্যসম্মত ও কর্মবান্ধব পরিবেশ, প্রয়োজনীয় ছুটি ও বিনোদনের সুযোগ, ধারাবাহিক ঝুঁকিপূর্ণ ও চাপযুক্ত (Stressfull) কাজ পরিহারসহ সুষম খাদ্য গ্রহণ জরুরি। প্রতিটি ব্যক্তি স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে মানসিকভাবে সুস্থ থেকে কাজ করতে না পারলে তার কাজের মান কমে যাবে এবং সার্বিক উৎপাদনশীলতা হ্রাস পাবে। কর্মক্ষেত্রে চাপ ও বিভিন্ন জটিলতা ব্যাক্তির মানসিক সুস্থতার অন্তরায়, তাই পরিবারের পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রকেও রাখতে হবে মানসিক স্বাস্থ্যবান্ধব। দিনের দুই তৃতীয়াংশ সময় আমরা কর্মক্ষেত্রেই কাটাই। জীবন-জীবিকা, উন্নতি-সমৃদ্ধি, যশ-সম্মান, অর্থ-বিত্ত সবই নির্ভর করে কর্মক্ষেত্রের ওপর। কর্মক্ষেত্রের পরিবেশের গুরুত্ব তাই স্বাভাবিকভাবেই সবার উপর স্থান পায়। মানসিক সুস্থতা ছাড়া সুস্থতা সম্ভব নয়। মানসিকভাবে সুস্থ না হতে পারলে আপনি কোনভাবেই কর্মক্ষম, যোগ্যতরভাবে গড়ে উঠতে পারেন না। কর্মক্ষেত্রের মানসিক

স্বাস্থ্য বা সুস্থতা শুধু ব্যাক্তির জন্য নয়, প্রতিষ্ঠান (সরকারি/বেসরকারি, কৃষি থেকে শিল্প, ব্যাংক-বীমা) সবার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এটি ব্যাক্তির উন্নতির জন্য তো বটেই প্রতিষ্ঠানের উন্নতির জন্য তদপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। কর্মক্ষেত্রে মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতিতে ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠান লাভবান হয় বিভিন্ন ভাবে।

৪. কর্মক্ষেত্রে মানসিক স্বাস্থ্য ও উৎপাদনশীলতা:

সুস্থ ব্যক্তি, সক্ষম ব্যক্তি, সুখী ব্যক্তি, তার থাকবে কর্মস্পৃহা, কর্মোদ্যম, যার মাধ্যমে বাড়বে উৎপাদন ক্ষমতা, ঘটবে উন্নয়ন। মানসিক অসুস্থতা কেড়ে নেয় সহস্র শ্রমঘণ্টা, ব্যক্তিটি থাকে অনুপস্থিত, হতোদ্যম, উৎপাদন কার্যক্রমে তাই ঘাটতি হতে বাধ্য। মানসিকভাবে সুস্থ, সুখী ব্যক্তিটি হাসি ফোটায় নিজ কর্মক্ষেত্রে, পরিবারে, সমাজে। ফলত ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ হয় হাসি-খুশি,প্রাণোচ্ছল আর সমৃদ্ধ হয় প্রতিষ্ঠান, সমাজ, আর দেশ। সুস্থ মানুষ তার পাশের জনকে, সহকর্মীকে সবসময় সহযোগিতা করে, সহমর্মিতা দেখায়, সাহায্যের হাত প্রসারিত করে, এতে সহকর্মীর জীবন হয় সুন্দর পরিপাটি, তার প্রভাব অতি অবশ্যই কর্মক্ষেত্রের উন্নতি, প্রসার। মানসিকভাবে সুস্থতা মানে চিন্তায়-চেতনায়, আবেগ-অনুভূতি, ইচ্ছা-স্পৃহায় সুস্থ ও সুন্দর আর সুস্থ না হলে সব কার্যক্রম মূল্যহীন আর গতিহীন হতে বাধ্য। এসব থেকে প্রতীয়মান কর্মক্ষেত্রে সুস্থ থাকাটা কতটা জরুরি।

৫. কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন মানসিক চাপের কারণ:

ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন ফর মেন্টাল হেলথ (WFMH)- এর প্রতিবেদনে বলা হয় মানসিক রোগের উল্লেখযোগ্য কারণ কর্মক্ষেত্রে মানসিক চাপ। বিশ্বায়ন ও পুঁজিবাদের জন্য কর্মক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা বেড়েছে। আর এতে সৃষ্ট কাজের চাপে কর্মীরা বিষণ্নতাসহ নানা মানসিক রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। অতিরিক্ত পরিশ্রম, কম পারিশ্রমিক, কর্মী ছাঁটাই, কর্মক্ষেত্রে অসন্তুষ্টি, সহকর্মীদের অসহযোগিতা, দারিদ্র্যতা ও সামাজিক অবস্থান হারানোর ভয়ে মূলত কর্মীরা বিষণ্নতায় ভোগেন। এছাড়াও কর্মক্ষেত্রে মানসিক চাপের বিভিন্ন ধরনের কারণ রয়েছে। যেমন:

- অশুভ এবং অসুস্থ তোষামোদ।
- উর্ধ্বতন কর্তৃক অধঃস্তনকে কারণে বা অকারণে বুলিং বা গালাগালি করা।
- একটানা লম্বা সময় ধরে কাজ করা বা বাড়তি কাজ করা।
- অফিসের কাজ বাড়িতে নিয়ে আসা।
- অনেক বেশি মানসিক শ্রমের কাজ করা।
- সহানুভূতি ও সহমর্মিতার অভাব।
- কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে মানসিক রোগকে অবহেলা, তুচ্ছজ্ঞান করা।

- অধঃস্তনদের অসুস্থতাকে গুরুত্ব না দেওয়া।
- কর্মক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা ও বিষাক্ত পরিবেশ।
- সম্মানবোধের অভাব।
- কাজে কর্মে স্বাধীনতার অভাব।
- লিঙ্গ বৈষম্য বা জাতিগত বিভাজন।
- কর্মক্ষেত্রে বিত্তের বৈষম্য। এসব কারণে মানসিক হেয় হওয়া, অবসাদগ্রস্ততা, এমনকি মানসিকভাবে অসুস্থ হওয়ার হারও কম নয়। প্রতি পাঁচ জনের একজন এমনি করে অসুস্থ হতে পারেন।

৬. কর্মক্ষেত্রে মানসিক চাপের ফলাফল:

কর্মক্ষেত্রে মানসিক চাপের ফলে বিভিন্ন ধরনের শারীরিক, মানসিক ও আচরণগত সমস্যা পরিলক্ষিত হয়। যেমন– শ্বাস-প্রশ্বাসের হার বৃদ্ধি, মাথা ধরা, উচ্চ রক্ত চাপ, হৃদরোগ, মুখের সমস্যা, পাকস্থলির আলসার, এবং হজমের সমস্যা ইত্যাদি। এছাড়া মানসিক আবেগ, উদ্বেগ, ক্লান্তি, অলসতা, অসহযোগিতামূলক মনোভাব, অসন্তুষ্টি, উত্তেজনা, বিরক্তি ও অসহিষ্ণুতামূলক আচরণসহ বিভিন্ন ধরনের মানসিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। বিভিন্ন ধরনের আচরণগত সমস্যা যেমন– কর্মত্যাগ, অনুপস্থিতি, কার্যসম্পাদন হ্রাস, নেশা জাতীয় দ্রব্য সেবন, আক্রমণাত্মক আচরণ, দুর্ঘটনা বৃদ্ধি, নিম্ন উৎপাদনশীলতা, খাদ্য অভ্যাস পরিবর্তন, ত্রুটিপূর্ণ কার্য ইত্যাদি পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। মানসিক অসুস্থতা কর্মীর শারীরিক, মানসিক এবং আচরণগত দিকের উপর প্রভাব বিস্তার করে। ফলে কর্মীর শারীরিক ও মানসিক অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে আচরণে পরিবর্তন আসে। এতে সুষ্ঠভাবে কার্যসম্পাদন করে সাংগঠনিক লক্ষ্য অর্জন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাছাড়া কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের চাপ এবং অশান্তি কর্মীর মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী হতাশার সৃষ্টি করে। এতে কর্মক্ষেত্রে ব্যক্তির অনুপস্থিতির হার বাড়ে। এ অবস্থায় অনেক ব্যক্তি কর্ম পরিত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। যারা কর্মক্ষেত্রে এ ধরনের দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হয়, তাদের অনেকেই মুক্তির পথ হিসেবে আত্মহত্যাকে বেছে নেয়।

৭. মানসিক চাপের ফলাফল অনুধাবন:

কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের কর্মী কাজ করে। বিভিন্ন কারণে বা উৎস হতে আগত মানসিক চাপ সকল কর্মীর মনে অশান্তির সৃষ্টি করে। কিন্তু মানসিক চাপ সকল কর্মীর উপর সমানভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। এতে সংগঠনের কর্মীদের মধ্যে ব্যক্তিত্বের পার্থক্য দেখা দেয়। ফলে মানসিক চাপের বহিঃপ্রকাশ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ঘটে। **S. P. Robbins** মানসিক চাপ এবং এর ফলাফল অনুধাবনের একটি মডেলের অবতারণা করেন।

মানসিক চাপের মডেল

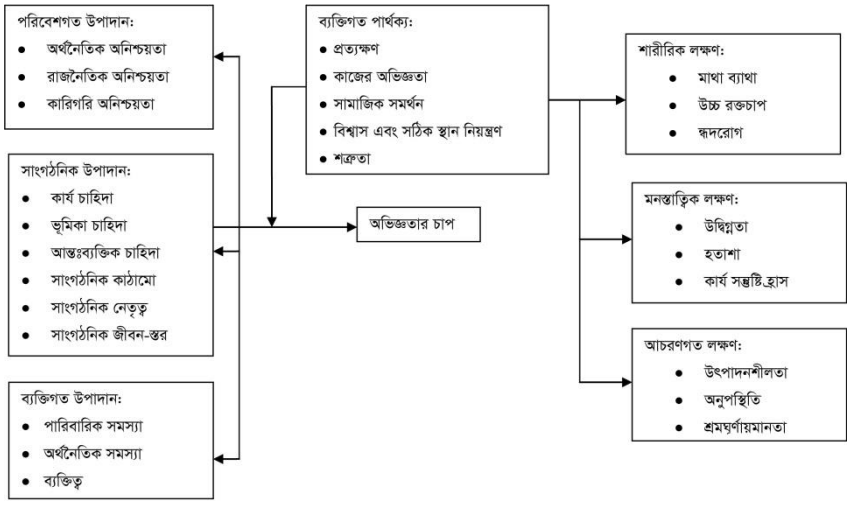

৮. কর্মীর তীব্র মানসিক চাপের লক্ষণঃ

- আরাম বা বিনোদনে কর্মীর অনাগ্রহ।
- সঠিক সময়ে কাজ সনাক্ত করতে না পারা।
- কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে অর্জিত ফলকে অর্থহীন মনে করা।
- কাজের প্রতি অনিহা ও নেশা জাতীয় দ্রব্যের তীব্র চাহিদা।
- উত্তেজনা বৃদ্ধি বা খিটখিটে মেজাজ প্রদর্শন।
- বাধাদানকারী কার্য সম্পর্কিত লক্ষ্য অর্জনের ধারাবাহিক প্রচেষ্টা গ্রহণ ইত্যাদি।

৯. মানসিক চাপ হ্রাসের উপায়ঃ

- ব্যবস্থাপকীয় যোগাযোগ দক্ষতা উন্নয়ন।
- অংশগ্রহণের মাধ্যমে কর্মীদের ক্ষমতা প্রদান।
- অধিকতর পরিতৃপ্তির জন্য কাজের পুনঃনকশাকরণ অথবা সাংগঠনিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন।
- দীর্ঘকালীন কাজে বাধাদান করে অতিরিক্ত সময় ব্যয় গ্রহণ।
- কর্মঘণ্টা ঠিক রেখে অন্য যে কোন সময় কার্যসম্পাদনের অনুমতি দান।
- মানসিক চাপ সৃষ্টি এবং মানসিক চাপ পরিহারকারী ব্যক্তি সনাক্তকরণ।
- স্বাস্থ্যসম্মত খাবার সংরক্ষণ।

- নিয়মিত অনুশীলন প্রতিষ্ঠা এবং যুক্তিসংগত লক্ষ্য প্রতিষ্ঠা।
- অলসতা পরিহার এবং নতুন কাজে সংশ্লিষ্ট হওয়ার পূর্বে বিশ্বস্ত বন্ধুদের সাথে পরামর্শ করা।
- কোন বিষয় পরিচালনায় সহজ-সরল পদ্ধতি উন্নয়ন এবং দৃঢ়ভাবে সমর্থন দান।
- তুলনামূলক শান্ত অবস্থানের জন্য আয়েশি পদমর্যাদা।
- শান্তিপূর্ণ কথাবার্তার পুনরাবৃত্তি এবং আনন্দদায়ক মানসিক ভাবমূর্তির উপর গুরুত্বারোপ।
- ধ্বংসাত্মক চিন্তা-ভাবনা ও নেতিবাচক ঘটনা পরিহার।
- অনেক ক্ষেত্রে বিনা বেতনে এবং ক্ষেত্র বিশেষ বেতনসহ কর্মীদের শিক্ষা বিষয়ক ছুটি প্রদান করা, এতে কর্মীরা মানসিকভাবে সতেজ হয়ে কার্যসম্পাদন করতে সক্ষম হয়।
- সহকর্মীদের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে সামাজিক সমর্থন বৃদ্ধি করতে হবে। এতে সফলতার সাথে মানসিক চাপ কমিয়ে সাংগঠনিক লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভবপর হয়।

১০. কর্মক্ষেত্রকে সুস্থ্য ও সুন্দর রাখার উপায়:

সুস্থ্য কর্মক্ষেত্রের কাঠামো তৈরিতে কয়েকটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। তা হলো– কাজ সম্পর্কিত শারীরিক ও মানসিক ঝুঁকি নির্ণয়ের ব্যবস্থা থাকা, সুস্থ আচরণের প্রকাশ্য সমর্থন ও সংস্কৃতি গড়ে তোলা, সমাজ ও পরিবেশের উত্তরোত্তর উন্নতি হবে এমন কর্মকাঠামো প্রণয়ন করা। কর্মক্ষেত্রকে সুস্থ ও সুন্দর রাখার আরও কিছু অন্যতম বিষয় হলো–

- প্রত্যেককে মানসিকভাবে সুস্থ ও সুন্দর হতে হবে।
- সহকর্মীর প্রতি সহমর্মিতা-সহযোগিতার হাত প্রসারিত করতে হবে।
- কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ সুস্থ/সুন্দর রাখতে হবে।
- মানসিক চাপ মুক্ত থাকার কৌশল শেখানো।
- নিজের প্রতি আস্থা বাড়ানোর চেষ্টা করা এবং ট্রেনিং দেওয়া।
- অসুস্থ বসিং এবং তোষামোদ বন্ধ করতে হবে।
- প্রয়োজনে চিকিৎসা সহায়তা প্রদান।
- মানসিক রোগ সম্বন্ধে কুসংস্কার মুক্ত হওয়া। তাই এসব বিষয়ে আরও সচেতনতা বাড়াতে হবে।

১১. কর্মক্ষেত্রে মানসিকভাবে সুস্থ থাকার উপায়:

কর্মক্ষেত্রে নিজেকে ভালো রাখতে নিজেকেই উদ্যোগী হতে হবে। যেমন– নিজের যত্ন নেওয়া, মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যার লক্ষণগুলো চেনা, মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে খোলাখুলি আলোচনা করা, মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণের উপায় খোঁজা, নিজের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকা, প্রয়োজনে ঊর্ধ্বতনের সহায়তা নেওয়া, সহকর্মীর প্রতি সহযোগীতার মনোভাব রাখা, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সংস্কৃতি গড়ে তোলা এবং মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে নিজে জানা, অন্যকে জানানো ও মেনে চলা। এছাড়া আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল–

- সময়ে বাড়িতে ফেরা,
- দুপুরের খাবারের বিরতি নেওয়া,
- প্রতিটি কাজের সময়সীমা তৈরি করা,
- ছুটির দিন ছুটি নেয়া,
- বিনোদনের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় বরাদ্দ রাখা ইত্যাদি বিষয়াদি কর্মক্ষেত্রে মানসিকভাবে সুস্থ থাকতে সাহায্য করে।

১২. উত্তম মানসিক স্বাস্থ্য সম্পন্ন ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যঃ

উত্তম মানসিক স্বাস্থ্য সম্পন্ন ব্যক্তি নিজের সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পোষণ করে, পাশাপাশি অন্যদের ব্যাপারে সঠিক অনুভূতি প্রকাশ করে এবং নিজেদের চাহিদা পূরণে সক্ষম হয়। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্ন ধরনের বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। যেমনঃ

- আবেগের ভারসাম্য রক্ষা, সহজ-সরল মনোভাব পোষণ, সামর্থ্যের অবমূল্যায়ন বা অতিমূল্যায়ন, নিজের দুর্বলতা সহজে গ্রহণ, নিজের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, যে কোন পরিস্থিতি মোকাবেলা করার যোগ্যতার অনুভূতি, দৈনন্দিন কাজে সন্তুষ্টি প্রকাশ ইত্যাদি।
- অপরের স্বার্থের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, ব্যক্তিগত সম্পর্ক বজায় রাখা, অন্যকে বিশ্বাস ও পছন্দ করা, ব্যক্তিগত পার্থক্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, নিজেকে দলের সদস্য মনে করা, প্রতিবেশীসহ অন্যের প্রতি দায়িত্ব পালন।
- সমস্যা সমাধানে সহায়তা, নিজের দায়িত্ব গ্রহণ, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রণয়ন, নতুন অভিজ্ঞতা ও ধারণা সাদরে গ্রহণ, স্বাভাবিক ক্ষমতার সঠিক ব্যবহার, সর্বশক্তি নিয়োগ ইত্যাদি উত্তম মানসিক স্বাস্থ্যের অধিকারী ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য।

১৩. বিভিন্ন গবেষণার প্রেক্ষিত কর্মক্ষেত্রে মানসিক স্বাস্থ্যঃ

কর্মীর মনের উৎকর্ষ কাজের পরিবেশ যেমন উন্নত করে, তেমনি চাপমুক্ত উন্নত পরিবেশ কর্মীর দক্ষতা বাড়ায়, উৎপাদনেও রাখে অগ্রগণ্য ভূমিকা। অথচ বিশ্বজুড়ে লক্ষ্য করা যায় কর্মক্ষেত্রে প্রায় সব কর্মীর মানসিক স্বাস্থ্যকে অবহেলা করা হয়। এতে সার্বিক স্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন ফর মেন্টাল হেলথ (WFMH-2017)- এর রিপোর্ট অনুযায়ী কর্মক্ষেত্রে প্রাপ্তবয়স্কদের প্রতি ৪ জনের একজন মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা ভোগ করে এবং কর্মীদের প্রতি ৫ জনের একজন মানসিক রোগের অভিজ্ঞতা পেয়ে থাকে। বিশ্বে বিষণ্নতায় আক্রান্ত ৫০ ভাগ কর্মী চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করেন না। যুক্তরাজ্যের এক প্রতিবেদন অনুযায়ী ২৫ ভাগ কর্মী তাদের কর্মক্ষেত্রকে মানসিক চাপ সৃষ্টির প্রধান কারণ হিসেবে মনে করেন। ২০১৩ সালে ৩১ টি ইউরোপীয় রাষ্ট্রের ওপর পরিচালিত এক

জরিপে ৫০ ভাগেরও বেশি কর্মী তাদের কাজের ধরণ ও কর্মক্ষেত্রকে মানসিক চাপের অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেন।

গবেষণায় দেখা যায়, বাংলাদেশের ২০-২৯ বছর বয়সী ৪৩ শতাংশ নারী পোশাক শ্রমিক মানসিক চাপে ভুগছেন (Steiner report-2016)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠান ঢাকা স্কুল অব ইকোনমিক্স ২০১৪ সালে মানসিক চাপ বিষয়ক জরিপ করেছিল। ২০ থেকে ২৯ বছর বয়সী নারীদের মধ্যে জরিপটি চালানো হয়। 'বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতে কর্মজীবী নারীদের মানসিক চাপের কারণ ও ফলাফল' শীর্ষক জরিপে দেখা যায়, ৪৩ শতাংশ নারী কর্মক্ষেত্রজনিত মানসিক চাপে ভুগছেন। তাঁরা কম পারিশ্রমিক, চাকরি হারানোর ভয়, বদলির কারণে মানসিক চাপে থাকেন। কর্মক্ষেত্রে বিষণ্নতার কারণে কাজে অনুপস্থিতির হার, অদক্ষতা, অক্ষমতা এবং উৎপাদনহীনতা কর্মীর চিকিৎসা ব্যয়ের চেয়েও ৪ গুণ আর্থিক ক্ষতির কারণ হয়ে দাড়ায়। ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন ফর মেন্টাল হেলথ (WFMH)- এর রিপোর্ট অনুসারে, কর্মক্ষেত্রে ১০ শতাংশ কর্মী শুধুমাত্র বিষণ্নতার কারণে যথাযথভাবে তাদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়। তাদের মধ্যে ৯৪ শতাংশই কাজে মনোযোগ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও মনে রাখার সমস্যায় ভোগেন। এতে একজনের গড়ে বছরে ৩৬ কর্মদিবসের অপচয় হয়। কর্মচারীর বিভিন্ন ধরনের বিষণ্নতার কারণে প্রতি বছর ৪০ কোটি (৪০০ মিলিয়ন) কর্মদিবসের অপচয় হয়। অথচ ৪ থেকে ৬ সপ্তাহের চিকিৎসায় ৮০ শতাংশ রোগীর উন্নতি হয় এবং ৮৬ শতাংশ রোগী কর্মদক্ষতা ফিরে পায়। বিশ্বজুড়ে গবেষণায় প্রমাণ মিলেছে, মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যার কারণে বিশ্বে প্রতি বছর আনুমানিক ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ২.৫ ট্রিলিয়ন ইউএস ডলার। আর ২০৩০ সালে এ ক্ষতি দাড়াবে ৬ ট্রিলিয়ন ডলারে। আবার দেখা যায়, ৮০ শতাংশ মানসিক রোগীর কর্মসংস্থান নেই। তার মধ্যে ৭০ শতাংশ কাজ চায় কিন্তু পায় না। এসব পরিসংখ্যান ছাড়াও দেখা যায় কর্মস্থলে নানা সমস্যা লেগেই থাকে। কাজের চাপ, সময়ের চাপ, সহকর্মীদের সাথে দ্বন্দ্ব, বসের শ্যেনদৃষ্টি সবকিছুই কাজের পরিবেশ নষ্ট করে। বিজ্ঞান এগিয়ে যাচ্ছে, একই সঙ্গে দ্রুততর হয়ে পড়ছে জীবনযাপন। বাড়ছে জীবন যন্ত্রণা ও আবেগের সমস্যা। ধৈর্যহীন হয়ে যাচ্ছে মানুষ। অল্পতেই রেগে ও ক্ষেপে যাওয়া, সহিংস আচরণ, নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি হারিয়ে যাচ্ছে। বুদ্ধি দিয়েই সব ধরনের সমস্যার সমাধান করতে হয়। কিন্তু আমরা দেখি কেবল বুদ্ধি দিয়ে সব সমস্যার সমাধান হয় না। বুদ্ধি খরচ করে আবেগের সমস্যার নেতিবাচক অবস্থার উত্তরণ ঘটে না। আবেগের সমস্যা কর্মদক্ষতা খর্ব করে। কিন্তু 'ইমোশনার ইনটেলিজেন্স' (ইকিউ) - এর মাধ্যমে আবেগ নিয়ন্ত্রণ করে সব ধরনের মানসিক চাপ মোকাবেলা করা যায়। নিজেকে সুশৃঙ্খল রাখা যায়। উৎপাদন ক্ষমতাও বাড়ানো যায়। এ জন্য আবেগ নিয়ন্ত্রণের প্রশিক্ষণ সব শ্রেণীর কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য অপরিহার্য হওয়া উচিত।

১৪. বাংলাদেশ প্রেক্ষিত কর্মক্ষেত্রে নারী:

কর্মক্ষেত্রে নারীরা এখনও পিছিয়ে। নারী পুরুষ বৈষম্য, পুরুষ সহকর্মী কর্তৃক উত্যক্ত ইত্যাদি বিষয়গুলি বাংলাদেশে এখনও বিদ্যমান। গর্ভধারণ ও স্ত্রীরোগ কর্মক্ষেত্রে মেয়েদের বাড়তি সমস্যা তৈরি করে। ফলশ্রুতিতে বেড়ে যায় কর্মক্ষেত্রে মেয়েদের মানসিক সমস্যার সম্ভাবনা।

শিশুশ্রম বাংলাদেশে নিষিদ্ধ হলেও বাসা-বাড়ি, গার্মেন্টসসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে এখনও শিশু শ্রমিক নিয়োগ লক্ষ্য করা যায়। এ ক্ষেত্রে মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের ঘটনাও প্রায়ই দৃশ্যমান।

প্রশাসনিক পদে নারীদের সংখ্যা তুলনামূলক কম। পুরুষ প্রশাসক এমনকি নারী প্রশাসকের কারণেও নারীরা কর্মক্ষেত্রে মাঝে মাঝে মানসিক চাপে পড়ে থাকেন। ফলে তাদের মাঝে তৈরি হয় ভয়, আতংক এবং কাজের প্রতি অনীহা।

আমরা অনেকেই মনে করি, মানসিক সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিকে দিয়ে কোন কাজ হবে না, সে অক্ষম। কিন্তু বাস্তবতা হলো সঠিক চিকিৎসার মাধ্যমে যে কোন সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি কর্মক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারে। এমনকি যার মানসিক সমস্যা নেই তার চাইতেও বেশি কর্মদক্ষতা দেখাতে পারেন ক্ষেত্রবিশেষে। মানসিক সুস্থতার যে স্তরেই আমরা থাকি না কেন, যেকোন সময়ে তা অসুস্থতার স্তরে নেমে যেতে পারে। মানসিক সমস্যা বা রোগের কারণে কর্মক্ষেত্রে বৈষম্য মানবাধিকার বিরোধী। মানসিক রোগীদের কর্মক্ষেত্র ও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের উদ্যোগ গ্রহণ বাস্তব সম্মত নয়।

তথ্যসূত্র:

১. Book: Organisational Behavior, Writer: Md. Habibur Rahman, Page: 481-496.

২. World Federation for Mental Health (WFMH) report- 2017. https://www.wfmh.global/wmhd-2017

৩. icddr,b report about mental health. http://www.icddrb.org/news-and-events/news?id710andtast=view

৪. World Health Organization (WHO) Mental Health in the Workplace, Information sheet-2017. http://www.who.int/mental-health/intheworkplace/en/

৫. World Mental Health Day-2017. Mental Health in the Workplace. http://www.paho.org/hq/index.php?option=com-content&view=article&id

৬. A guide for employers to promote mental health in the workplace.

www.enwhp.org>fileadmin>downloads/8th-Intiative/MentalHealth-Broschoere- Arbeitgeben.pdf

৭. Mental Health at Work-Institute for Employment Studies. www.employment-studies.co.uk/system/files/mp75.pdf

৮. What is Mental Health-White Swan Foundation. http://bengali.whiteswanfoundation.org/artical/what-is-mental-health/

৯. The daily Shangbad (Newspaper-news about mental health) 10th October 2017.

১০. The daily Shamakal (Newspaper-news about mental health) 10th October 2017.

নারী শ্রমিকদের সমস্যা ও করনীয়

সাহিদা পারভীন শিখা[১]

আমাদের দেশে নারীরা যুগ যুগ ধরেই নানা ধরনের বৈষম্য, বঞ্চনা, অবহেলা ও নির্যাতনের শিকার হয়ে আসছে। দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই নারী। এই অর্ধেক জনগোষ্ঠীর মৌলিক অধিকার হরণ ও মর্যাদাহীন অবস্থা আমরা কোনভাবেই একটি সমৃদ্ধ ও উন্নত আধুনিক বাংলাদেশ গড়ে তুলতে পারবো না। নারী শ্রমিকসহ সামগ্রীকভাবে নারীদের মর্যাদাহীন ও অধিকারহীন করে রাখা বা পিছিয়ে দেয়ার অপচেষ্টা নানাভাবেই হয়ে থাকে। তবে এ জন্য দায়ী প্রধানত প্রবল পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা। এক্ষেত্রে সামাজিক ও পারিবারিক দৃষ্টিভঙ্গিও কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারীর এগিয়ে যাওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করে থাকে। তবে আশা ও উৎসাহের কথা এটাই যে, সব প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করে এবং মোকাবেলা করে নারীরা আজ নানা কর্মকান্ডে এগিয়ে আসছে। সামাজিক ও ধর্মীয় অনুশাসন ও বিধিনিষেধ উপেক্ষা করে মেয়েরা বিভিন্ন পেশায় অংশগ্রহণ করছে। অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নারীর অবদান বাড়ছে। জাতীয় উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। পুলিশ, সেনাবাহিনী, বিমান চালনাসহ নানা ধরনের চ্যালেঞ্জিং পেশায়ও নারীরা যোগ দিচ্ছে এবং সাফল্যের স্বাক্ষর রাখছে।

শ্রমবাজারেও নারীর অংশগ্রহণ দিন দিন বাড়ছে। অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়া এবং পরিবারের আর্থিক প্রয়োজন মেটানোর তাগিদে নারীরা বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত হচ্ছে। দেশের সংবিধান, প্রচলিত শ্রম আইন, আইএলও কনভেনশন ইত্যাদি সব কিছুতেই নারী-পুরুষের সমঅধিকার ও সমমর্যাদার কথা উল্লেখ থাকলেও নারী শ্রমিকরা প্রায় ক্ষেত্রেই মজুরি বৈষম্যের শিকার হয়। এ ছাড়াও কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানিসহ নারীদের নানা ধরনের হয়রানির সম্মুখীন হতে হয়। সম্মান ও মর্যাদা নিয়ে কাজ করা অনেক ক্ষেত্রেই নারীদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। পরিবার, কর্মক্ষেত্র, চলাচলের পথ কোনোটাই নারীর জন্য নিরাপদ নয়। মাতৃত্বকালীন ছুটি ও শিশু রক্ষণাবেক্ষণ কেন্দ্র না থাকায় অনেক সময়ই নারী শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্র থেকে বিদায় নিতে হয়।

'৮০ সাল থেকে আমাদের দেশে ব্যাপক গার্মেন্টস কারখানা তৈরি হয়েছে। এই কারখানায় শতকরা ৭০-৮০ ভাগই নারী শ্রমিক। পোশাক শিল্প ছাড়াও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী শ্রমিক কর্মরত আছে চা বাগানে। চা বাগানে মোট শ্রমিকদের ৫১ শতাংশের বেশি নারী। তাদের বেতন এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা খুবই কম বলে তারা মানবেতর জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়। এছাড়া আরও বেশ কিছু অসংগঠিত খাতে বিপুল সংখ্যক নারী শ্রমিক কাজ করে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– নির্মাণ, চাতাল, চিংড়ি চাষ, পরিচ্ছন্ন ইত্যাদি।

---

১ ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠক, সাধারণ সম্পাদক, জাতীয় নারী শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র

কৃষি কাজেও নারীদের অংশগ্রহণ ব্যাপক। অথচ তাদের কাজের কোনো স্বীকৃতি নেই। গৃহকর্মে নিয়োজিত নারীরাও সব ধরনের অধিকা থেকে বঞ্চিত। গৃহকর্মে নিয়োজিত শ্রমিকদের জন্য "গৃহ শ্রমিক সুরক্ষা নীতিমালা" আছে তবে সেটার বাস্তবায়ন নেই।

পোশাক শিল্পে নারী শ্রমিকদের সংখ্যা ৭০ শতাংশেরও বেশি হলেও প্রায়ই তাদের অস্থায়ীভিত্তিতে নিয়োগ করা হয়। কাজের কোনো নিরাপত্তা এক্ষেত্রে যেমন থাকে না তেমনি চাকরি-পরবর্তী পেনশন বা অন্যকোনো আর্থিক সুযোগ-সুবিধাও পাওয়া যায় না। কর্তৃপক্ষের ইচ্ছানুযায়ী জাতীয় ছুটির দিন কিংবা সপ্তাহান্তে ছুটির দিনও অনেক কারখানা খোলা থাকে। কর্তৃপক্ষের ইচ্ছামাফিকই শ্রমিকদের কাজ করতে হয়। অধিকাংশ পোশাক তৈরি কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার না থাকায় নারী শ্রমিকরা যখন-তখন ছাঁটাইয়ের শিকার হয়। নিয়মানুযায়ী নারী শ্রমিকদের রাতের শিফটে কাজ করা নিষিদ্ধ। কিন্তু বাংলাদেশে পোশাক কারখানায় নারীদের কাজ শুরু হয় সকাল ৮টায় এবং শেষ হয় কমপক্ষে রাত ১০টায়। এক্ষেত্রে মেয়েদের জীবনের নিরাপত্তা ও শ্রম আইনের বিষয়টিকে কোনো গুরুত্ব দেয়া হয় না।

যে সব নারী কোনো না কোনো পেশায় নিয়োজিত হয়ে আয়-উপার্জন করছে, সমাজে ও পরিবারে তাদের অবস্থা ভালো হওয়ার কথা। তাদের মর্যাদা বাড়ার কথা। কিন্তু আমাদের দেশে সব ক্ষেত্রে কি তা হচ্ছে? কর্মজীবী নারীদের প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি একেবারে রক্ষণশীল না হলেও খুব প্রসারিত হয়েছে সেটাও বলা যায় না। আবার পরিবারেও কর্মজীবী নারীদের অবস্থা সবক্ষেত্রেই খুব উন্নত হয়েছে সেটাও বলা যায় না। তাদের ওপর বরং কিছুটা বাড়তি চাপ সৃষ্টি হয়েছে। তাদের বাইরেও কাজ করতে হচ্ছে আবার সংসারও সামলাতে হচ্ছে। তাছাড়াও উপার্জিত অর্থ নিজের প্রয়োজনমতো ব্যয় করার স্বাধীনতাও শ্রমজীবী নারীর নেই। এই অবস্থার পরিবর্তন হওয়া দরকার। এসব সমস্যা সমাধানের জন্য কি কি করা যেতে পারে তা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করা দরকার।

দেখা যাচ্ছে নারী শ্রমিকরা দেশের শ্রমিক শ্রেণির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে যেমন শোষিত, তেমনি নারী হিসেবেও তারা আলাদা ধরনের কিছু সামাজিক শোষণ, বৈষম্য ও অবিচারের শিকার হচ্ছে। সেজন্যই তাদের কিছু বিশেষ সমস্যা ও দাবি আছে। নারী শ্রমিকদেরই প্রধানত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করতে হয়। পরিবেশগত কারণেই বক্ষব্যাধি, শ্বাসকষ্টসহ বিভিন্ন জটিল রোগে নারী শ্রমিকদের বেশি মাত্রায় আক্রান্ত হতে দেখা যায়। বৈরি কর্মপরিবেশে ৪/৫ বছর টানা কাজ করলে তাদের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে, তারা কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। পৃথক টয়লেট না থাকা, এমনকি বাথরুমে যাতে কম যেতে হয় সেজন্য পানি খাওয়ার অভ্যাসকে নিরুৎসাহিত করা, এবং বিশুদ্ধ খাবার পানির পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না থাকায় কিডনিসহ নানা ধরনের বিশেষ স্ত্রীরোগও অনেকের হয়ে থাকে।

সমান কাজে সমাজ মজুরি ছাড়াও নারী শ্রমিকদের জন্য আরও যেসব সমস্যার জরুরি সমাধান হওয়া দরকার সেগুলো হলো–

- সরকারি নীতি অনুযায়ী বেতনসহ প্রসূতিকালীন ছুটি,
- স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ,
- কর্মস্থলে পৃথক টয়লেট,
- শিশু রক্ষণাবেক্ষণ কক্ষ,
- নিরাপদ যাতায়াত সুবিধা এবং
- বাসস্থানের ব্যবস্থা।

বাংলাদেশের শ্রম আইন ২০০৬-এ নারী শ্রমিকদের যে সব অধিকার ও সুযোগ সুবিধার কথা কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য :

- সম কাজের জন্য সম মজুরি,
- নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর কাজের পরিবেশ,
- মাতৃত্বকালীন ছুটি ও শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ কেন্দ্র,
- পয়ঃপ্রণালীর সুব্যবস্থা ইত্যাদি।

শ্রম আইনে এমনও বলা হয়েছে যে, কোনো প্রতিষ্ঠানের কোনো কাজে নারী নিযুক্ত থাকলে তিনি যে পদমর্যাদারই হোন না কেন, তার প্রতি উক্ত প্রতিষ্ঠানের কেউ এমন আচরণ করতে পারবে না যা অশালীন কিংবা অভদ্রজনোচিত বলে গণ্য হতে পারে কিংবা যা উক্ত নারীর শালীনতা ও সম্ভ্রমের পরিপন্থী।

বাংলাদেশের শ্রম আইনে নারী শ্রমিকদের যে সব অধিকার এর কথা বলা হয়েছে তার বাস্তবায়ন প্রয়োজন।

পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা: বিল্‌স এর উদ্যোগ ও কার্যক্রম

মোঃ ইউসুফ আল-মামুন[১]

পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা কর্মক্ষেত্রের জন্য বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ একটি বিষয়, বিশেষতঃ শ্রমিকের জীবনের সুরক্ষা ও তার শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে। বাংলাদেশের কর্মক্ষেত্রসমূহের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা অনেক মর্মান্তিক দুর্ঘটনার কথা মনে করতে পারি, যা আমাদের শ্রমিকের জীবনের নিরাপত্তার বিষয়ে উদ্বিগ্ন করে তোলে। তবে আশার কথা হলো, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার জন্য বাংলাদেশে যথাযথ আইন, বিধি ও নীতিমালা রয়েছে, যার সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে নিরাপদ কর্মক্ষেত্র ও শ্রমিকের জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব। এর জন্য চাই আমাদের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন, শিল্পসম্পর্কের সঠিক চর্চা ও সামাজিক সংলাপ এবং সর্বোপরি সচেতনতা জোরদার করা।

বাংলাদেশ সরকার জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা-২০১৩ প্রণয়ন করেছে। এর আলোকে একটি জাতীয় পর্যায়ের ত্রিপক্ষীয় জাতীয় সেইফটি কাউন্সিল গঠিত হয়েছে। এই নীতিমালাকে কার্যকর করতে সহায়ক রয়েছে শ্রম আইন ও বিধিমালা। সে অনুযায়ী কারখানা পর্যায়ে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সেইফটি কমিটি গঠন বাধ্যতামুলক করা হয়েছে। একটি বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠেছে জাতীয় প্রতিষেধক ও সামাজিক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান (নিপসম), যেটি জনস্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমুহে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। তবে এ ক্ষেত্রে মূল যে ইস্যুটি বিবেচনায় আনা প্রয়োজন সেটি হচ্ছে, কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক কর্মকাণ্ডে ট্রেড ইউনিয়নের মাধ্যমে শ্রমিকের অন্তর্ভুক্তি ও অংশগ্রহণ।

বিল্‌স শ্রমিকের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ট্রেড ইউনিয়নসমূহের সক্ষমতা বিনির্মাণে কাজ করে আসছে। পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে মূলত আইনের সঠিক বাস্তবায়ন, কার্যকর শ্রম পরিদর্শন নিশ্চিতকরণ, কর্মক্ষেত্রভিত্তিক যুগোপযোগী স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা পরিকল্পনা প্রণয়ন, মালিকপক্ষের জন্য উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি পরিচালনা করা, আইন ও নীতি বাস্তবায়নে মালিকপক্ষের জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, নিয়মিত গবেষণা পরিচালনা ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়নে সরকার ও মালিকপক্ষের অংশীদার হিসেবে ট্রেড ইউনিয়নকে সক্ষম করে তোলার কাজে সহযোগিতা করে আসছে বিল্‌স। পাশাপাশি ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে শিক্ষাবিদ, গবেষক ও নাগরিক সমাজের নেটওয়ার্ক তৈরি করার কাজেও সহযোগিতা করছে বিল্‌স।

---

১ উপ-পরিচালক (তথ্য), বিল্‌স

পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তায় ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা বিবেচনায় রেখে বিল্‌স যে নীতি গ্রহণ করেছে, তার মধ্যে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে শ্রমিকের জীবন রক্ষা ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নিরাপদ কর্মক্ষেত্র নিশ্চিত করা, এ সংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় নীতি প্রণয়ন ও সংশোধনীর সাথে ট্রেড ইউনিয়নের সংশ্লিষ্টতা, নীতি নির্ধারনি ও বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ/কমিটির সঙ্গে বৈঠক ও সামাজিক সংলাপ, শ্রমিক-অংশীদার-সমাজকে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে সচেতন করে তোলা, ট্রেড ইউনিয়নের সক্ষমতা বিনির্মাণ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা এবং আইনী সহযোগিতার ওপর।

বিল্‌স নীতি গ্রহণের পাশাপাশি একে এগিয়ে নিতে যে কৌশলগত পরিকল্পনা করেছে তার মধ্যে রয়েছে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে কার্যকর সমন্বয় কমিটি গঠন করা, ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে বিশেষায়িত টিম গঠন, সেক্টরভিত্তিক ট্রেড ইউনিয়ন টিম গঠন যার মধ্যে প্রধানত রয়েছে নির্মাণ, রি-রোলিং, তৈরি পোশাক ও বিদ্যুৎ খাত, অসংগঠিত খাতসমুহকে ট্রেড ইউনিয়নের মাধ্যমে সহায়তা করতে অঞ্চলভিত্তিক ট্রেড ইউনিয়ন ফোরাম গঠন এবং ট্রেড ইউনিয়ন ও নাগরিক সমাজের মধ্যে নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা।

এ সমস্ত নীতি ও কৌশলগত পরিকল্পনার ফলে সেক্টরভিত্তিক পরিবর্তন দৃশ্যমান হচ্ছে। যেমন, জাহাজভাঙ্গা কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিল্‌স এর উদ্যোগে ২০১০ সালে চট্টগ্রামে বিভিন্ন শিল্পের ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে গঠিত হয় জাহাজভাঙ্গা শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন ফোরামের আহবায়ক কমিটি, যেটি উক্ত শিল্পে শ্রমিকের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার বিষয়ে প্রশিক্ষণ, সচেতনতা, অ্যাডভোকেসি ও লবিং এর মতো গুরুত্বপুর্ণ দায়িত্ব পালন করে। একই সময়ে সীতাকুন্ডে বিল্‌স এর উদ্যোগে স্থাপিত হয় একটি পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, যা নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণ ও স্বাস্থ্যসেবার উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্যক্যাম্পের নিয়মিত আয়োজন করতে থাকে। এ সমস্ত উদ্যোগের ফলে জাহাজভাঙ্গা কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা কমে এসেছে, শ্রমিকদের সচেতনতাও জোরদার হয়েছে। তবে শ্রম আইন অনুযায়ী কর্মক্ষেত্রে স্থায়ী সুরক্ষা নিশ্চিত করতে এবং দুর্ঘটনা প্রতিরোধে প্রয়োজনে পরিদর্শন কার্যক্রমকে নিয়মিত ও জোরদার করা। সে লক্ষ্যেও বিল্‌স সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের বিভিন্ন অংশীদারদের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে।

এর আগে চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের শ্রমিকদের স্বাস্থ্য নিরাপত্তা ও তাদের অধিকার সুরক্ষার লক্ষ্যে গঠিত হয় খুলনা চিংড়ি শিল্প শ্রমিক স্বার্থ সংরক্ষণ সমন্বয় কমিটি। কর্মক্ষেত্রে সুরক্ষা ও ন্যায্য মজুরি সংক্রান্ত বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে এই কমিটি সরকারী ও বেসরকারি পর্যায়ের অংশীদারদের সঙ্গে কাজ করেছে। এর ধারাবাহিকতা বিল্‌সকে পরবর্তীতে মৎস্যশ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রের সুরক্ষা নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্র তৈরি করে দিয়েছে।

একই সময়ে চালকল ও চাতাল শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় দিনাজপুর, খুলনা ও ময়মনসিংহ অঞ্চলে গঠিত হয় চাতাল শ্রমিক সহায়তা কমিটি (চাসক)। চাতাল শ্রমিকদের ওপর গবেষণা পরিচালনা, শ্রম আইন বিষয়ক প্রশিক্ষণ পরিচালনা, সরকারের সাথে এডভোকেসি ও লবি, ক্যাম্পেইন পরিচালনা, চাতালের কর্মপরিবেশ উন্নয়ন, আইন সহায়তা প্রদান,

চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদান এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আহত শ্রমিকদের পুনর্বাসনে এই কমিটি কাজ করেছে। কমিটির মাধ্যমে বিল্স নিরাপদ চাতালের একটি মডেলও প্রস্তাবনা করে। শ্রমিক ও মালিকপক্ষের সাথে নিয়মিত বৈঠকের পাশাপাশি বিভিন্ন সময়ে বয়লার বিস্ফোরণে হতাহত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করার বিষয়েও বিভিন্ন পক্ষের সাথে কাজ করেছে এই কমিটি।

নির্মাণ শ্রমিদের পেশাগত স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ২০১০ সালে নির্মাণ শ্রমিকদের সকল ইউনিয়ন, ফেডারেশন মিলে গড়ে তোলে নির্মাণ শ্রমিক ঐক্য পরিষদ। বিল্স এর সহযোগিতায় জাতীয় পর্যায়ের একটি সম্মেলনের মাধ্যমে নির্মাণ শ্রমিক ঐক্য পরিষদে ৫ দফা দাবীনামা চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয় এবং এটি সরকারের কাছে পেশ করা হয়। এতে পেশাগত স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও কর্মপরিবেশ সংক্রান্ত যে দাবীটি ছিল তার মধ্যে কর্মস্থলে ঝুঁকিপূর্ণ কাজের ক্ষেত্রে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে যথোপোযুক্ত নিরাপত্তা সামগ্রী নিয়োগকর্তা কর্তৃক সরবরাহ করাসহ শক্ত মাঁচা, সিঁড়ি, সেফটি নেটিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ, দুর্ঘটনায় নির্মাণ শ্রমিক নিহত হলে তাঁর পরিবারকে কমপক্ষে ১০ লক্ষ টাকা নিয়োগকর্তা কর্তৃক প্রদান, আহত হলে তাঁর পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, স্থায়ীভাবে অঙ্গহানী হলে কমপক্ষে ১২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা প্রদান, পেশাগত রোগের কারণে শ্রমিক আংশিক/সম্পূর্ণ কর্মক্ষমতা হারালে পর্যাপ্ত চিকিৎসা ও দুর্ঘটনার ন্যায় ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা, পুরুষ শ্রমিকদের জন্য সর্বোচ্চ ৩০ কেজি এবং মহিলা শ্রমিকদের জন্য ২০ কেজির বেশি ওজন বহন নিষিদ্ধ করা, সরকার কর্তৃক নির্মাণ শ্রমিকদের জন্য নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা, অগ্রাধিকারভিত্তিতে সরকারি হাসপাতাল সমূহে নির্মাণ শ্রমিকদের বিনামূল্যে চিকিৎসা ও সংরক্ষিত ওয়ার্ডের ব্যবস্থা, কর্মক্ষেত্রে প্রাথমিক চিকিৎসার সুব্যবস্থা, কর্মস্থলে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা, পুরুষ ও মহিলা শ্রমিকদের জন্য পৃথক পৃথক পর্যাপ্ত শৌচাগার ও ধৌতাগারের ব্যবস্থা করা এবং কর্মক্ষেত্রে নারী শ্রমিকদের যৌন হয়রানী থেকে রক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ ও তাদের জন্য সুষ্ঠ কর্মপরিবেশ সৃষ্টির দাবীগুলো অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরবর্তীতে আইএলও'র সহযোগিতায় নির্মাণ শ্রমিকদের জন্য আইডি কার্ড প্রদান সংক্রান্ত একটি পাইলট প্রকল্পও বাস্তবায়ন করে বিল্স। এ ছাড়া নির্মাণশ্রমিকদের জন্য গোষ্ঠী বীমা স্কিম চালু করার ক্ষেত্রে সরকারের সাথে ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষে কাজ করে বিল্স। এর ফলে কোনো নির্মাণ শ্রমিক কোনো ধরনের দুর্ঘটনায় পড়লে, অসুস্থ হলে বা মারা গেলে দুই লাখ টাকা দেবে সরকার। নির্মাণ শ্রমিকদের জন্য চালু করা এ বীমার প্রিমিয়াম বছরে ১ হাজার ৩০০ টাকা।

পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে দু'বছরের একটি প্রকল্পও বাস্তবায়ন করে বিল্স, যার মাধ্যমে নির্মাণ, রি-রোলিং,ম্যাচ ফ্যাক্টরি ও বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের শ্রমিকদের নিয়ে কাজ করা হয়। এর মধ্যে ছিল প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা উন্নয়ন, ওএইচএস টিম গঠন, গবেষণা, তথ্য সেবা, ডকুমেন্টেশন এবং প্রতি বছর বিশ্বব্যাপী কর্মক্ষেত্রে হতাহত শ্রমিকদের স্মরণে কোমেমরেশন ডে পালন করা। এখনও প্রতি বছর ২৮ এপ্রিল দিনটিকে কেন্দ্র করে একাধিক কর্মসূচি গ্রহণ করে বিল্স, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রতিবছর বাংলাদেশের

কর্মক্ষেত্রে হতাহত শ্রমিক ও কর্মক্ষেত্র পরিস্থিতি নিয়ে তথ্য, গবেষণা, অনুসন্ধানী প্রতিবেদন মিডিয়াতে প্রকাশ করে জনমনে সচেতনতা তৈরি করা।

পেশাগত কারণে অসুস্থ এবং দুর্ঘটনায় আহত শ্রমিকদেরকে চিকিৎসা সেবা, বিকল্প প্রশিক্ষণ ও উপকরণ প্রদানের মাধ্যমে পুনরায় কর্মক্ষম করার লক্ষ্যে বিল্‌স ঢাকার কল্যাণপুরে ২০১১ সালে একটি ফিজিওথেরাপি ও পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে ৮৭ জনকে কৃত্রিম অঙ্গ সংযোজন ও ২৬ জন কে আত্মকর্মসংস্থানের জন্য উপকরণ প্রদান করা হয়। এই কেন্দ্রের উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন এলাকায় শ্রমিকদের জন্য চিকিৎসার্থে স্বাস্থ্যক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। পরবর্তীতে ২০১৩ সালে রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পর এই কেন্দ্রটি সাভারে স্থানান্তর করা হয় এবং সেখানে পরবর্তী দু'বছর রানা প্লাজায় ক্ষতিগ্রস্থ শ্রমিকদের শারীরিক, মানসিক চিকিৎসাসেবা, ফিজিওথেরাপি, রানা প্লাজায় আহত গর্ভবতী নারী শ্রমিকদের সার্বিক সেবা ও পরিচর্যা এবং আহত শ্রমিকদের পূনর্বাসনে এই কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন সহযোগিতা করা হয়।

বিল্‌স এর গবেষণা টিম ২০১২ সালে লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম উপজেলার বুড়িমারীতে পাথর গুঁড়ো করার কাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি গবেষণার মাধ্যমে তাদের দেহে মরণব্যাধি সিলিকোসিসের উপস্থিতির সন্ধান পায়। পেশাগত এই মরণব্যাধী রোগে আক্রান্ত শ্রমিকদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ও এ বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রচারণার মাধ্যমে প্রতিরোধকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে বিল্‌স লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম উপজেলার বুড়িমারী এলাকায় সিলিকোসিস রোগে আক্রান্ত শ্রমিকদের সুরক্ষায় ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে। এর মধ্যে ছিল স্বাস্থ্যক্যাম্প ও সংকটাপন্ন রোগীদের জন্য নিবিড় পরিচর্যা ও চিকিৎসা, কৌশলগত নীতি প্রণয়নে জাতীয় পর্যায়ের সেমিনার, সচেতনতা বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি কমিয়ে আনতে করণীয় নির্ধারণে মালিকপক্ষ, স্থানীয় সরকার ও প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা এবং জনসচেতনতা সৃষ্টিতে প্রচার ও প্রকাশনা।

শ্রমঘন এলাকা হিসেবে চট্টগ্রামে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার বিষয়ে সচেতনতা জোরদার করতে ২০১৭ সাল থেকে সেখানে নিয়মিত পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা মেলার আয়োজন করে আসছে। এই মেলায় বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের অংশ গ্রহণ, নিরাপত্তা সরঞ্জাম প্রদর্শন ও পরিচিতি, কর্মশালা, সেমিনার ও আলোচনার মাধ্যমে পরিদর্শনকারীদের মধ্যে সচেতনতা জোরদার করা সম্ভব হচ্ছে।

কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক ইস্যু নিয়ে বিল্‌স এর নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন সময়ে সরকার ও মালিকপক্ষের সঙ্গে অ্যাডভোকেসি ও লবিং করে থাকেন, যার মাধ্যমে এ সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা ও তার ফলপ্রসূ সমাধানে উদ্যোগ নেয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়। এ বিষয়ে সম্যক অবগত হতে নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন কর্মক্ষেত্র পরিদর্শনও করে থাকেন।

পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে ট্রেড ইউনিয়ন ও অন্যান্য অংশীদারদের প্রশিক্ষিত করে তুলতে বিল্‌স শুরু থেকেই নিয়মিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু রেখেছে। এ ক্ষেত্রে জাতীয় ও স্থানীয় ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের জন্য প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ, যুব নেতৃবৃন্দের জন্য ওরিয়েন্টেশন ও ফলোআপ প্রশিক্ষণ, আইএলও ও এনসিসিডব্লিউইর সাথে এবং শ্রম পরিদর্শন বিভাগের সাথে যৌথ প্রশিক্ষণ উল্লেখযোগ্য।

সর্বশেষ যে বিষয়টি উল্লেখযোগ্য তা হচ্ছে প্রচার, প্রকাশনা ও সচেতনতামুলক কার্যক্রমের মাধ্যমে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়টি শ্রমজীবি মানুষ ও জনমনে তুলে ধরা। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময় প্রকল্পসমূহের আওতায় এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উপলক্ষে হ্যান্ডবুক, লিফলেট, শ্লোগানসমৃদ্ধ ফেস্টুন, স্টিকার, ব্যাগ, টিশার্ট, ক্যাপ, ছাতা ইত্যাদি তৈরি ও বিতরণের মাধ্যমে জনমনে সচেতনতা তৈরিতে বিল্‌স প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। বিভন্ন দিবস উপলক্ষে র‍্যালি ও বিভিন্ন সময়ে কর্মক্ষেত্র পরিস্থিতি মিডিয়ার মাধ্যমে জনগণের কাছে তুলে ধরতে সংবাদ সম্মেলন, সেমিনার, গোলটেবিল বৈঠক ইত্যাদি আয়োজন করে থাকে বিল্‌স।

এভাবে শ্রমজীবি মানুষের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার বিষয়টি আরও এগিয়ে নিতে ট্রেড ইউনিয়ন, বেসরকারি সংগঠন ও নাগরিক সমাজের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরাম, যার সচিবালয় হিসেবে কাজ করছে বিল্‌স। এই ফোরাম কর্মক্ষেত্রে সংঘটিত পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক বিভিন্ন পরিস্থিতির ওপর নিয়মিত নজর রাখে ও তা পর্যালোচনা করে শ্রমিকের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো সরকার, মালিকপক্ষ ও মিডিয়ার মাধ্যমে জনগণের কাছে তুলে ধরে।

উপরোল্লেখিত কার্যক্রমের মাধ্যমে বিল্‌সের যে অর্জন হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কর্মজীবী মানুষের জন্য একটি নিরাপদ কর্মক্ষেত্র গড়ে তুলতে জাতীয় পর্যায়ে সচেতনতা সৃষ্টি, যার অংশীদার সরকার, মালিকপক্ষ, শ্রমিকপক্ষ ও নাগরিক সমাজ। পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নীতির খসড়া প্রণয়নে সরকারের সাথে ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষ থেকে যুক্ত থেকে বিল্‌স তার ভূমিকা পালন করেছে, জাহাজভাঙ্গা কর্মক্ষেত্রে নীতি প্রণয়ন কমিটির সদস্য হিসেবে কাজ করেছে, টাম্পাকো দুর্ঘটনায় মানবাধিকার কমিশনের তদন্ত কমিটিতে যুক্ত থেকে পরিস্থিতি সম্পর্কে শ্রমিকপক্ষের বক্তব্য তুলে ধরেছে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পক্ষসমূহের সমন্বয়ে গঠিত রানা প্লাজা সমন্বয় কমিটির সাথে যুক্ত হয়ে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ ও বন্টন প্রক্রিয়া তত্ত্বাবধান করেছে- এই ভাবে শ্রমজীবি মানুষের অধিকার ও মর্যাদা এবং তাদের জন্য নিরাপদ কম ক্ষেত্র ও শোভন কাজ নিশ্চিত করতে প্রতিনিয়িত কাজ করছে বিল্‌স। তাই নিরাপদ কর্মক্ষেত্র বিষয়ে বিল্‌স এর নীতিগত শ্লোগান হচ্ছে "নিরাপত্তা শ্রমিকের মানবাধিকার, দরকষাকষির বিষয় নয়"। আর ক্যাম্পেইনের জন্য শ্লোগান "নিরাপদ কর্মক্ষেত্র জীবন বাঁচায়, উৎপাদন বাড়ায়"।

শিশুরা শ্রমের হাতিয়ার নয়, জাতির ভবিষ্যৎ

মামুন অর রশিদ[১]

আরমান হোসেন, বয়স ১৩ বছর। এ বয়সে তার কাঁধে থাকার কথা ছিল বই আর কলম ভর্তি ব্যাগ। কিন্তু তার কাঁধে বই খাতার ব্যাগের পরিবর্তে এখন সংসারের বোঝা আর হাতে গ্যারেজের গাড়ি ঠিক করার যন্ত্রপাতি। আরমানের মত এমন হাজারো শিশুর হাতেই বিভিন্ন কল করাখানার যন্ত্রপাতি। নিজের এবং পরিবারের থাকা খাওয়ার বন্দোবস্ত করার জন্যই আজ তাদের হাতে বইয়ের পরিবর্তে যন্ত্রপাতি।

প্রতিনিয়ত দেশে অব্যাহতভাবে শিশুশ্রম বাড়ছে। দেশের বিভিন্ন কলকারখানা, বাসাবাড়ি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসহ সব জায়গায়ই এখনও বেআইনিভাবে শিশুদের নিয়োগ দেয়া হয়। শিশুশ্রম বন্ধে কঠোর আইন থাকলেও তা বন্ধ করা যাচ্ছে না। গণমাধ্যমেও এ নিয়ে বিস্তার লেখালেখি হলেও টনক নড়ছে না সংশ্লিষ্টদের। ওয়েল্ডিং কারখানা, গাড়ির গ্যারেজ, ওয়ার্কশপ, বিভিন্ন পরিবহনসহ ঝুঁকিপূর্ণ বিভিন্ন কাজে শিশুদের ব্যবহার করা হচ্ছে। বড় বড় কলকারখানা, পোশাকশিল্প থেকে সবখানেই শিশুশ্রমিক চোখে পড়ে।

বিভিন্ন দেশে আর্থসামাজিক অবস্থার ভিন্নতা, সাংস্কৃতিক ও মূল্যবোধের ভিন্নতা, প্রকৃতি ও পরিবেশের ভিন্নতার কারণে দেশে দেশে শিশুর বয়স নির্ধারণে কিছুটা পার্থক্য আছে । আবার একই দেশে কাজের ধরন ও কাজের পরিবেশের কারণে শিশুর বয়স নির্ধারণে পার্থক্য রয়েছে। যেমন জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ(১৯৮৯) অনুযায়ী ১৮ বছরের নিচে সব মানব সন্তানকে শিশু বলা হবে। আইএলও কনভেনশন ১৩৮ অনুযায়ী ১৫ বছরের নিচে সকল মানব সন্তানকে শিশু বলা হবে, কিন্তু ঝুঁকিপূর্ণ কাজে ১৮ বছরের নিচের বয়সের মানব সন্তানকে শিশু বলা হবে। জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ এবং বাংলাদেশের সংবিধানে অনুযায়ী আঠারো (১৮) বছরের কম বয়সি সকল বাংলাদেশি ব্যক্তিকে শিশু হিসেবে এবং চৌদ্দ (১৪) থেকে আঠারো (১৮) বছরের কম বয়সি শিশুদেরকে কিশোর/কিশোরি হিসেবে গন্য করা হয়। স্কুল চলাকালীন সময় চৌদ্দ (১৪) বছরের নিচে কোন শিশুকে তার পরিবারের লিখিত অনুমতি ছাড়া উৎপাদনশীল কাজে নিয়োগ দেয়া বা কাজ করিয়ে নেয়াকে শিশুশ্রম হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অথবা শিশু শ্রম বলতে শিশুদের শ্রমের সময় প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদন কাজে এবং পরোক্ষভাবে গার্হস্থ্য শ্রমে ব্যয় করাকে বোঝায়।

প্রচলিত আইনের মাধ্যমে নির্ধারিত বয়সের চেয়ে কম বয়সে কাজে নিয়োজিত সকল শ্রমিকই শিশু শ্রমিক। বিশেষজ্ঞদের মতে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক সকল ক্ষেত্রে শিশুর জন্য শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক দিক থেকে ক্ষতিকর এবং শিশুর প্রয়োজন ও অধিকারের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন বঞ্চনামূলক শ্রমই শিশু শ্রম ।

---

১ তথ্য কর্মকর্তা, বিল্‌স

জাতীয় শিশুশ্রম জরিপ-২০১৩ অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রায় সাড়ে ৩৪ লাখ শিশু নানা ধরনের শ্রমের সঙ্গে জড়িত। এদের মধ্যে অন্তত ১২ লাখ ৮০ হাজার শিশুই ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত। এক শ্রেণির স্বার্থ লোভী মানুষ দারিদ্রের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে শিশুদের দ্বারা কাজ করায়। কেননা এ সকল শিশুদের শ্রমের মূল্য খুবই নগণ্য।

শিশুদেরকে বেতন, মুনাফা বা বিনাবেতনে কোন পারিবারিক খামার, উদ্যোগ বা সংস্থায় কাজের জন্য নিয়োগ করা শিশু শ্রমের আওতায় পড়ে। এটিকে শোষণমূলক হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং অনেক দেশই এটিকে অবৈধ ঘোষণা করেছে। অর্থনৈতিক টানাপোড়েন বেশিরভাগ পরিবারকে তাদের সন্তানদের উপার্জনমূলক কাজে জড়িত করতে বাধ্য করে।

বাংলাদেশে শিশুশ্রম আইনগতভাবে নিষিদ্ধ নয়। ২০০৬ সালের শিশু সনদে ১৪ বছরের কম বয়সী শিশুদের শ্রম নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং ১৮ বছরের কম বয়সি শিশুদের ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োগ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। শিশুশ্রম আইনে কারখানায় ১৮ বছরের কম বয়সের শিশুদের নিয়োগ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

শিশুদের কাজ হলো লেখাপড়া করা আর খেলাধুলা করা। কিন্তু আমাদের দেশে শিশুদের লেখাপড়া বাদ দিয়ে অনেক অভিভাবক তাদের সাংসারিক কাজে লাগান। অনেক জায়গায় দেখা যায়, শিশুদের শ্রম বিক্রি করে অভিভাবকরা টাকা রোজগার করেন। এ কারণে তাদের লেখাপড়াও বন্ধ হয়ে যায়।

শিশুশ্রম ও শিশুর কাজ এক নয়। যে কাজ শিশুর শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও মানসিক বিকাশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, সেটা শিশুশ্রম। শিশু তার নিজের ও পরিবারের প্রয়োজনে কিছু কাজ করতেই পারে। প্রশ্ন উঠতে পারে, শিশুশ্রম কেন ক্ষতিকর? কাজ করবে এর মধ্যে আবার ক্ষতির কী আছে? ক্ষতিটা আসলে শিশুর মানসিক এবং শারীরিক। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে শিশুরা মূলত কাজ করে এমন সব প্রতিষ্ঠানে যেগুলোর আনুষ্ঠানিক তেমন কোনো ভিত্তি নেই। এ সব প্রতিষ্ঠানে কাজের নির্দিষ্ট কোনো সময় নেই, নিয়মকানুন মানার বিধিনিষেধ নেই, কোনটা শিশুর জন্য ক্ষতিকর তা বিবেচনার ব্যবস্থা নেই। তারা এমন সব কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে যেগুলো তাদের বয়সে করার কথা স্বাভাবিক অবস্থায় ভাবাই যায় না। এমন পরিবেশে কাজ করে শিশুরা অল্প বয়সেই বিভিন্ন রোগের কবলে পড়ে যায়। পরিশ্রমের ক্লান্তির কারণে, পর্যাপ্ত সময় না থাকায় লেখাপড়া থেকে কার্যত ছিটকে পড়ে। আর শিশুদের বৃদ্ধির যে স্বাভাবিক পন্থা, সেই পন্থা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে।

অন্যদিকে শিশুশ্রমিক হিসেবে কাজ করতে গিয়ে শিশুরা প্রতিনিয়তই নিগ্রহেরও শিকার হচ্ছে। গৃহকর্মীদের উপর নির্যাতনের ভয়াবহ চিত্র আমরা সাম্প্রতিক সময়ে বেশ কয়েকবার দেখেছি। আমরা সেই নির্যাতন দেখেছি বা সংবাদপত্রের পাতায় পড়েছি বলে আঁতকে উঠছি, কিন্তু এ রকম হয়ত আরো অনেক গৃহকর্মী প্রতিনিয়ত নির্যাতনের শিকার

হয়ে বেড়ে উঠছে, যাদের দেখার কেউ নেই। শিশুশ্রম বন্ধ না হলে এমন নির্যাতন বন্ধ হবে না বলেই আমার ধারণা।

আবার শিশুশ্রমের কিছু কারণও আছে। শিশুশ্রমের জন্য বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্য একমাত্র কারণ নয়। আমাদের মানসিকতাও এর জন্য দায়ী। আমরা কিছু মানুষ মনে করি, ওরা দরিদ্র। ওদের সমস্যা আছে। তাই ওরা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করবেই। শিশুশ্রম সস্তা হওয়ায় শিশুদের শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ দিয়ে থাকে। তাদের নির্বিচারে খাটায়। এমনকি নানাভাবে নির্যাতনও করে, ফলে প্রতিদিনই নির্যাতনের শিকার হচ্ছে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে কর্মরত শিশু শ্রমিকরা। অমানবিক নির্যাতনের শিকার হয়ে অকালে প্রাণও হারাচ্ছে অনেক শিশু। সংবাদপত্রের পাতায় প্রায়ই শিশু শ্রমিকের উপর নির্যাতনের খবর দেখতে দেখা যায়। আমরা দেখি শিশুশ্রমের পেছনে অভিভাবকদের অসচেতনতা যেমন দায়ী তারচেয়ে বড় দায় থাকে দারিদ্র্যতা, কর্মহীনতা এবং সামাজিক নিরাপত্তার অভাব। দেশে এ বিষয়ে আইন থাকলেও তাদের দারিদ্র্য, অশিক্ষা তথা পরিবারের দুর্বলতা এবং ঘটনা গোপন থাকায় অনেক সময়ই বিচার হয় না। আমাদের এ ধরনের মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

বিভিন্ন পর্যায়ে শিশুশ্রম নিরসনে সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে তৈরি পোশাক শিল্প ও চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পকে শতভাগ শিশুশ্রম মুক্ত হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এছাড়া ৩৮টি ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুদের প্রত্যাহারের লক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের জন্য প্রায় ২৮৫ কোটি টাকার একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে। ২০৩০ সালের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ২০২৫ সালের মধ্যে শিশুশ্রম নিরসনে সম্প্রতি নতুন করে কর্মপরিকল্পানা প্রণয়ন করেছে। কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী জাতীয় পর্যায় থেকে জেলা-উপজেলা পর্যায়ে শিশুশ্রম নিরসনে একটি কমিটি কাজও করছে।

তবে বিভিন্ন সেক্টরে বেশকিছু উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হলেও অনেক সেক্টরকে এখনো শিশুশ্রম মুক্ত করা সম্ভব হয়নি। এ বিষয়ে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টি হলেও দৃষ্টির অগোচরে দেশে অনেকগুলো সেক্টর আছে যেখানে শিশুশ্রম অব্যাহত রয়েছে। সুতরাং শিশুশ্রম নিরসনে কর্মরত সরকারি-বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠানকে একযোগে মনোনিবেশ করতে হবে যাতে বাংলাদেশে শিশুশ্রম শূন্যের কোটায় নেমে আসে। এ লক্ষ্যে পৌঁছাতে সর্বপ্রথম জনসচেতনতামুলক কার্যক্রমটি এমন পর্যায়ে নিতে হবে যাতে বাংলাদেশে প্রত্যেকটি নাগরিকের কাছে শিশুশ্রম একটি ঘৃণ্যতম বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। এছাড়াও শিশুরা কেন শ্রমের সাথে সম্পৃক্ত হচ্ছে তার কারণগুলো আরো ব্যাপকভাবে খুঁজে বের করতে পর্যাপ্ত গবেষণামুলক কার্যক্রম হাতে নেয়া প্রয়োজন। কারণ শিশুশ্রম নিরসনে নিখুঁত পরিকল্পনা প্রণয়নে সঠিক কারণগুলো চিহ্নিত করা অত্যন্ত জরুরী।

অমাদের শিশুশ্রম বন্ধে প্রকৃত সমাধান বের করতে হবে। নির্দ্দিষ্ট খাত থেকে শিশুশ্রম মুক্ত করার পর ওসব শিশুদের পড়ালেখায় সম্পৃক্ত করতে হবে। অন্যথায় শিশুগুলো আবারো

অন্যান্য খাতে শ্রমে নিযুক্ত হয়ে পড়বে। একান্তই যদি কোনো পরিবারকে শিশুর আয়ের ওপর চলতে হয়, তাহলে সেই পরিবারকে সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনীর মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। পরিবারের কর্মক্ষম অভিভাবকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে, শিশুদের ফ্রি চিকিৎসা ও লেখাপড়ার সমস্ত খরচ বহন অর্থাৎ প্রতিটি পরিবারের কর্মক্ষম সদস্যদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা ছাড়াও শিশুদের মৌলিক অধিকার বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সরকারি বরাদ্ধের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থা ও প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরা যদি পথশিশুসহ কর্মরত শিশুদের কল্যাণে প্রাথমিক পর্যায়ে কারিগরি ও কৃষি শিক্ষা প্রদান করতে পারে তাহলে এসব শিশু অল্প মজুরিতে শ্রম বিক্রি না করে স্বাবলম্বী হতে পারবে। ওদের কারিগরি ও কৃষি শিক্ষায় শিক্ষিত করতে পারলে মানবসম্পদে পরিণত করা সম্ভব হবে। এ ক্ষেত্রে শহরের বস্তিসহ গ্রামে কারিগরি শিক্ষা প্রদানে উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। শিশু শিক্ষা খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের কোনো প্রকার অপচয় কঠোর হাতে দমন করতে হবে। এ ব্যাপারে জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন।

আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। এ শে- াগানকে সামনে রেখে শিশুকে ভবিষ্যতের জন্য সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। শিশুকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হলে তার বেড়ে ওঠার জন্য প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। শিশুরা যাতে হেসে-খেলে স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠতে পারে, সে ব্যবস্থা করতে হবে।

বাংলাদেশের আইনেই আছে ১৪ বছরের কম বয়সিদের কাজে নিয়োগ দেয়া যাবে না আমি মনে করি, এই আইনের প্রয়োগ করতে হবে কঠোরভাবে। এখানে সরকারের দায়িত্ব অনেক। জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে শিশুশ্রম বন্ধ করে সেসব শিশুকে লেখাপড়ার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া, তাদের লেখাপড়ায় উৎসাহিত করার জন্য উদ্যোগ নিতে হবে, বিনিয়োগ করতে হবে।

শিশুরা দেশের ভবিষ্যৎ জনশক্তি, আজকের শিশু আগামী দিনের নাগরিক এবং দেশের কর্ণধার। শিশুই আমাদের আশা ভরসা। শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বপ্রথম দেশ থেকে দারিদ্র্য দূর করতে হবে। দূর করতে হবে নানা কুসংস্কার। যে শিশু আগামীর নাগরিক, সে শিশুর জীবন যদি অরক্ষিত হয়ে যায় তবে আমাদের গোটা সমাজই বিপন্ন হয়ে পড়বে। অতীত যেমন আমাদের মাঝে বেঁচে আছে। আমরাও বেঁচে থাকবো ভবিষ্যতের মাঝে। শিশুদের হাতেই জাতির উন্নয়ন সম্ভাবনার চাবিকাঠি তাই শিশুদেরকে গড়ে তুলতে হবে আমাদেরই। শিশুরা জাতির সেরা সম্পদ। আজ যারা শিশু, আগামীকাল হবে তারাই দেশ গড়ার সৈনিক। বলা হয় শিশুরা শ্রমের হাতিয়ার নয়, জাতির ভবিষ্যৎ; শিশুদের হাতে ভিক্ষার থলে নয়, চাই বই ও কলম। শিশুকে তার প্রাপ্য পূর্ণ অধিকার দিয়ে গড়ে তুলতে কলঙ্কমুক্ত হবে আমাদের সমাজ ও সামাজিক বৈষম্য।

বিল্‌স

বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক শ্রমিক আন্দোলনকে সুসংহত, স্বনির্ভর ও ঐক্যবদ্ধ করতে সহায়তা প্রদান এবং জাতীয় পর্যায়ে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি গড়ে তোলার লক্ষে ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ 'বিল্‌স' প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিল্‌স-এর লক্ষ ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপ :

- সকল শ্রমজীবী মানুষকে তাদের মৌলিক ট্রেড ইউনিয়ন ও মানবাধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলা এবং সংগঠিত হতে উদ্বুদ্ধ করা;
- বাংলাদেশের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে শক্তিশালী ও গতিশীল করার লক্ষে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী, সংগঠক ও নেতৃবৃন্দের দক্ষতা উন্নয়নে সহায়তা করা;
- পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা এবং কর্ম-পরিবেশের উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য কাজ করা;
- নারী-পুরুষসহ শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে বিদ্যমান সকল প্রকার বৈষম্যের অবসান ঘটানো, বিশেষ করে কর্মক্ষেত্র ও ট্রেড ইউনিয়নে নারীর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করা;
- সংগঠন পরিচালনার জন্য গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করা;
- শ্রমিক অধিকার স্বার্থে বাংলাদেশের শ্রমিক আন্দোলনে বৃহত্তর ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা;
- শ্রমিক আন্দোলনের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করা;
- বর্তমান দ্রুত পরিবর্তনশীল অবস্থা ও ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জসমূহ সম্পর্কে ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ ও সংগঠনসমূহকে অবহিত করার লক্ষে তথ্য সরবরাহ, গবেষণা ও অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা করা;
- মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষে বহুমুখী কর্মকান্ড পরিচালনা করা;
- শ্রমিক কর্মচারী এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে প্রচেষ্টা চালানো;
- উৎপাদন বৃদ্ধি, শিল্পে শৃঙ্খলা রক্ষা এবং শিল্প সম্পর্ক উন্নয়নের লক্ষে কর্মসূচি গ্রহণ করা।